ভাস্কর্য

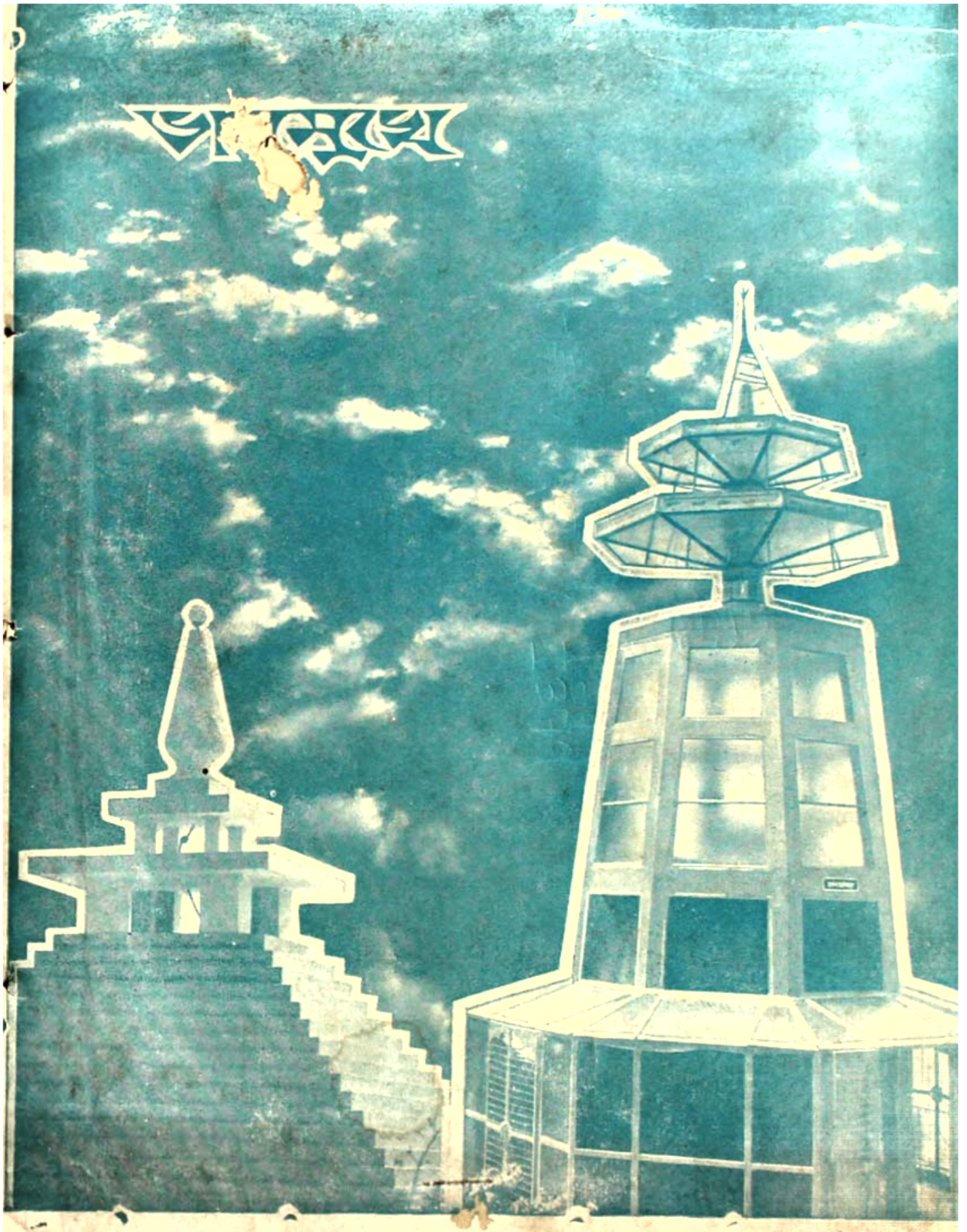

পৌষ * ষষ্ঠবিংশ বর্ষ * তেরশো উনআশি * শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী।

ভারতে মোটর পার্টস ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

১৩৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা - ২৬

শাখা—কলিকাতা (রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড) পাটনা ধানবাদ কটক
বহরমপুর (গঙ্গাম) শিলিগুড়ি • আসানসোল গৌহাটী দিল্লী

DE LUXE

ORPHAN'S TEA

For

Health & Economy

ORPHAN TEA SYNDICATE

133, Cornwallis St. Shyambazar

Phone 55-2704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত] মূল্য—পাঁচ টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D.RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CAL-6
PHONE : 34 - 3711

ডি.রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

পৌষ
নবম সংখ্যা

সূচী পত্র

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ
তেরশ' উনত্রিশি

সারদা স্মরণিকা

গান	শ্রীশ্রীঠাকুর
শ্রীমা	উদ্ধৃতি
শ্রীমা'র একটি বাণী	শ্রীঅর্চনাপুরী
শ্রীশ্রীমা সারদামণি	সম্পাদকীয়—স্বামী নীলানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	শ্রীঅর্চনাপুরী
বসন্ত বল্লোকহিতং চরন্তঃ	অরিন্দম দাশগুপ্ত
একটি ছোট্ট প্রশ্ন	শ্রীমৃগেন্দ্র ডুগর
নিবেদন	শ্রীশচীন্দ্র নাথ সান্যাল
নমঃ শ্রীশ্রীসারদা দেব্যৈ	শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র গুপ্ত
মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়
রসো বৈ সঃ	সাধনাপুরী
পরলোক ও পূর্বজন্ম প্রসঙ্গে	
স্বামী অভিদানন্দ	স্বামী শিবানন্দ
ঋষিং পুরাণাম্	শ্রীশরণাপুরী
কল্যাণেশ্বরী তীর্থ ভ্রমণ	যোগদাপুরী
মা	স্বামী অরূপানন্দ
আদ্যাশক্তি সারদা	শ্রীনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
মা	ব্র, মি
মা সারদা	প্রবুদ্ধ
মণি মন্দিরের মা	স্বামী হীরানন্দ
ডঃ অমলেন্দু মিত্রের "ঘাটের সংস্কৃতি"র উপর	৪৬০
সত্যানন্দ বাণী	৪৬৯
আশ্রম সংবাদ	৪৬৩
শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতী সংবাদ	৪৬৪

শ্রীরামকৃষ্ণ পদ ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা

কোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭।৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

★

৮৪ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

সত্ত্বাধিকারী :—

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স

World Psychology 91 Sreemant Swami Satyananda Deva
A peep into a Private Live 93 Swami Bimalananda
Francis Thompson—The poet of the Return to God Shailendra Nath Chakravetty

আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : মাঘ, ১৩৭৯

১৫ই জানুয়ারী '৭৩ ১লা মাঘ, সোমবার = একাদশীর উপবাস ও হোম।
১৮ই ৪ঠা বৃহস্পতিবার = পূর্ণিমার হোম।
২৩শে ৯ই মঙ্গলবার = বিদ্যাপীঠে নেতাজীর জন্মদিবস পালন
২৫শে ১১ই " বৃহস্পতিবার = শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা ও উৎসব।
৩০শে ১৬ই " মঙ্গলবার = একাদশীর উপবাস ও হোম।
৩রা ফেব্রুয়ারী ২০শে " শনিবার = অমাবস্যার হোম
৮ই ২৫শে " বৃহস্পতিবার = শ্রীশ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতী পূজা

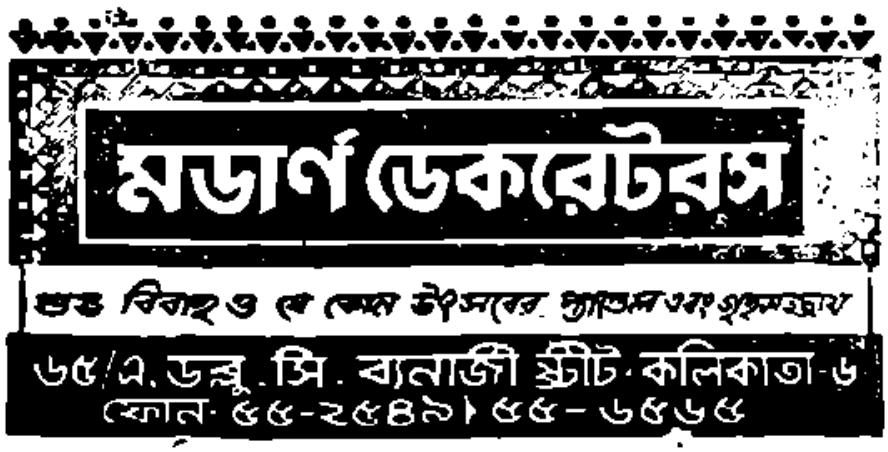

বেঙ্গল কেমিক্যালের

অণুমকরধ্বজ

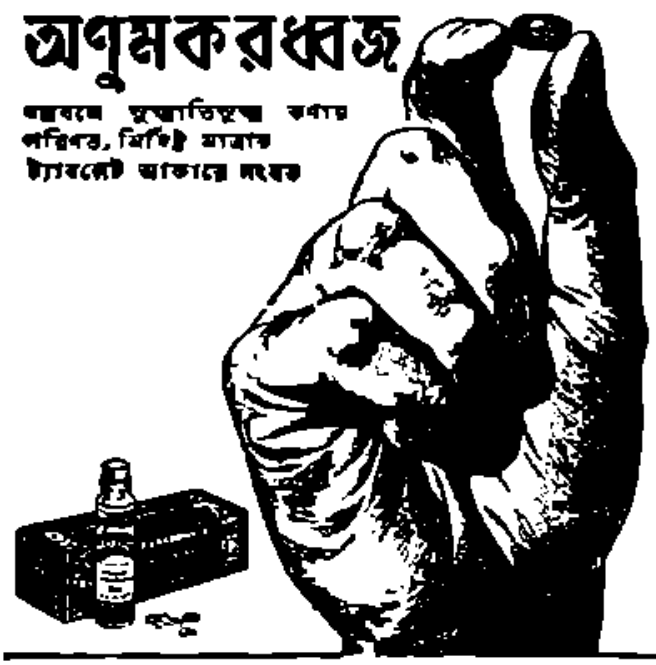

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর

A long felt want fulfilled

SONG OF THE SOUL

Swami Satyananda

Price—Rs. 3·00

A book of poems divinely composed by Sri Sri Thakur Satyananda Deva, the founder preceptor of Sri Ramkrishna Ashram and published from Sri Ramkrishna Sevayatan. 2, P. K. Saha Lane, Baranagore, Calcutta-36. Dr. S. P. Sengupta, M. A., Ph.D. (Lond.), The Head of the Dept. of English, says :—'They have in them the light that never was on sea or land. The untranslatable delicacies of colour, the subtleties and nuances of expression, the rich melody and verbal marvels, and above all, the extra-ordinary synthesis of thought, content and music have made the poems unforgettable treasures that posterity will not willingly let die.'

RAMKRISHNA SEVAYATAN—2, Pran Krishna Saha Lane, Cal.-36

শাল আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক,
তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও
আধুনিক ডিজাইনের ডেক্রণ, টেরিলিন, টুইল ও
ওয়াস্ এণ্ড ওয়্যার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার কলিকাতা-৭

ফোন ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing
Flexible shaft Grinder, Etc.

Manufactured by

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA,
CALCUTTA-56

PHONE : 61-1715

: ৩৪-৭৯৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

●

যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা।
বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয়
প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

Gram : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of stainless steel, chemical plants, pharmaceutical & fruit preservation equipments.

161, UPPER CHITPUR ROAD,
CALCUTTA-5

With best compliments from

KHAS CHALBALPUR COLLIERY

Calcutta Office
4, Ganesh Chandra Avenue,
Calcutta-13
Phone : 23-9647
23-7513

Agent's Office
P. O. Jaykaynagar
Dist. Burdwan
Phone : Asansol-2747

BHARAT COAL CORPORATION

4, GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-13.

Office : 23-9647
23-7513
Res. 23-1897

With best compliments from

R. B. S. RUBBER MILLS (P) LTD.

MANUFACTURERS OF :

Cock, Sponge & Corrugated Electrical Sheets, Red Star, Plastorub and Shyma Tubings, Industrial & Mechanical Goods.

Sales Office
3, Bentinck Street
Calcutta-1
PHONE : 23-1971, 23-7083
GRAM "AARBIAS" CALCUTTA

Factory :
Jwala Prasad Park
Liluah, (Howrah)
PHONE : 66-2910, 66-3806
GRAM "RUBBER" LILUAHA.

"Man is the highest temple of God and the worship of God through man is therefore the highest"

—VIVEKANANDA

Emsons Pharmaceuticals Private Limited.

IN THE SERVICE OF MANKIND

144A, RASH BEHARI AVENUE,
CALCUTTA-29.

Phone Office : 46-7910 44-4834

N. G. CHAKRABARTI & CO.

MANUFACTURERS OF ALLOY STEEL CUSTINGS

Such as

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC STAINLEES STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

Also

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS
OF
ALL SPECIAL GRADES & SIZES

QUALITY—GUARANTEED

Works
K-65, HOWRAH INDUSTRIAL ESTATE,
P. O. BALTIKURI
HOWRAH, (West Bengal)
Telephone : 66-4843

Office
3-D, NANDY STREET,
CALCUTTA-29
Telephone : 47-5248
Telegram : ENGEECEE

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ	তেরশ' উনআশি	পৌষ	নবম সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

হেমন্তেরি আকাশ আর
ভরা মাঠের দিন
নীল সকালে কবিতাতে
মেঘের রেখা ভিন ॥
পাখর ভাঙ্গা যুগের সাথে
চন্দ্র মুখের আলো
পৌষালী বায় বইলো যে গো
লক্ষ্মী মায়ের চিন ॥
সারু মায়ের আঙ্গিনাতে
পদ্ম ওঠে জেগে
অনেক দিনের ভোলা নূপুর
বাজলো রিন ঠিন ॥

প্রীমা

যুগে যুগে যার আসা—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

যুগের সারথি হতেই তো অবতীর্ণ হওয়া—ধর্মের প্রতিষ্ঠাই তো অবতরণের রহস্য···পাশ্চাত্যে মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠার নিরিখ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, নানাভাবে মাতৃজাতিকে উদ্বুদ্ধ ও মুক্ত করার চেষ্টার এই মাহেন্দ্রক্ষণ; এর সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি অমা-মথিত দ্বিতীয়া এক রজনী—ফলহারিণী কালিকা-পূজার এক পুণ্যতিথি···

আবর্তিত শত আঁখি মেলে সেদিন কালো মেয়ে প্রতীক্ষারত—নয়ন আসরে পরমলগ্নের এক সুখের ঝমক—আনন্দোচ্ছল সুরধুনী যেন নিরুদ্ধ আশায় কম্পিত—দক্ষিণেশ্বরে একদিকে সেদিন উৎসব সজ্জার রাত্রি, আর অন্যদিকে শ্রীঠাকুরের মন্দিরে জ্বলে উঠেছে একটি নিবাত প্রেম-প্রদীপ—সামান্য উপাচারে—ধূপে-দীপে, প্রাণের পূজার মন্ত্রই হচ্ছে ছন্দিত···উদার অভ্যুদয়ের মুহূর্তগুলি তো ইতিহাসের হারানো পাতা—গভীর গম্ভীরে ভাগে মধুছন্দের মন্ত্রমালা—ষোড়শী মাতৃকার আবাহনী—হে বালে—হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ, ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর—রহস্য-পূজার কন্দরে বসেছেন শ্রীঠাকুর—আর আলিম্পন মণ্ডিত আসনে জননী সারদা—ত্রিপুরাসুন্দরী নিজে·· সব সমাপ্তির পূজা—ফলহারিণী ভবানীর এই পূজাই শ্রীঠাকুরের শেষ পূজা—নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার শেষ আয়োজন—আপন জপমালা দেবীর চরণে নিবেদনে জানান প্রণাম—হে সর্বমঙ্গলে—শিবগেহিনি, নারায়ণি তোমায় প্রণাম! প্রণাম!!

এর পরের কথা—ব্রহ্ম আর শক্তি হয়ে যান অভেদ—দুই আত্মা সমাধিতে হয়ে যান—অদ্বয়।

বিশ্বের মাতৃপ্রতিষ্ঠা এই দিনই ঠিক হয়েছিল—মাতৃজাতির চিরকল্যাণের দ্বার সত্য করে এই দিনই হয়েছিল অপাবৃত—বিশ্বনাথ এই দিনেই নিজেকে করেন বিশ্বজননীর চরণে সমর্পণ—শিব যে অন্নপূর্ণার দ্বারে সর্বহারা···বারশো আশির জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী তিথিই এই মহালগ্নের তিথি।

(ষোড়শী পূজার অংশ হইতে উদ্ধৃত)

জননী সারদেশ্বরী—শ্রীঅর্চনাপুরী

মর্মচক্ষে ভেসে ওঠে একদিকে জগৎ জননীর স্নেহরসসিক্ত কান্ত-করুণ কল্যাণরূপ, অপর দিকে স্নেহের অমোঘ শক্তিতে দ্রবীভূত, পরাভূত পশুশক্তি। দেবশক্তির চির বিজয় ···নবচণ্ডীর অভ্যুদয়ে। মাতৃকণ্ঠেই শুনি সেই কথা, আমি তাদের বল্লুম—"তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো?" তারা উত্তর দিলে, "তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা যে তোমাকে কালীরূপে দেখলুম।" আমি বল্লুম, সেকি গো—তোমরা এটা কি দেখলে? তারা বল্লে,—"না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম, আমরা পাপী ব'লে তুমি রূপ গোপন ক'রচো।" আমি বল্লুম, কি জানি, আমি তো কিছু জানি না।"

(ডাকাত বাবার অংশ হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমা'র একটি বাণী

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

শ্রীশ্রীমার একটি বাণী—সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। কর্ম্ম-চঞ্চল বর্ত্তমান যুগের পক্ষে এই বাণী একটি বিশেষ সাধনার ইঙ্গিত স্বরূপ ধরা যেতে পারে। উপনিষদে আছে—আদৌ শ্রদ্ধা। প্রশ্ন উঠতে পারে, উপনিষদে একথা বলা হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কিন্তু মা'র কথার মধ্যে যে ছোটনা সে তো স্বাভাবিক কাজের ক্ষেত্রেই মনে হয়। এর উত্তরে মনে পড়ে কোন মহাপুরুষের জীবনবেদের কথা। তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নিরন্তর ভাগবৎ চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা চোখে পড়ত। প্রতিদিন তিনি তাঁর পিতলের ঘটীটি খুব মনোযোগ সহকারে তন্ময় হ'য়ে মাজতেন, যার ফলে সেই সামান্য পিতলের ঘটীটি সোনার মতই উজ্জ্বল দেখাতো। এই ব্যাপারের উল্লেখ ক'রে তিনি বলতেন—মন সাধন তন সিদ্ধি। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজকে যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধনার এক একটি অঙ্গ হিসাবে নিই তা'হলে প্রত্যেকটি কাজই হবে সাধনার সহায়ক ও দিব্যতার মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত।

শ্রীশ্রীমার বাণীটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা দেখতে পাই। প্রত্যেকটি কাজে তাঁর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা অতুলনীয়। তাঁর কর্ম্ম-সঙ্গিনীদের কখনও ভালবেসে কখনও মৃদু তিরস্কারে তিনি এ বিষয়ে অবহিত করে দিয়েছেন। গৃহ মার্জ্জনা করার পর কোন সেবিকা যদি সম্মার্জ্জনীটিকে অযত্ন অবহেলায় ছুঁড়ে এক কোণে ফেলে দিয়েছে, বলেছেন—ও কি গো ঝাঁটি দেওয়া হ'য়ে গেলে অমনি ওকে অবহেলা? দেখো ঝাঁটাটারও একটি মর্য্যাদা আছে, কাজের শেষে ওটিকে যত্ন করে এক পাশে রেখে দিতে হয়। এটি যে কত বড় শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনে, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। এই যে ঝাঁটাটিকে ছুঁড়ে ফেলার মধ্যে হয়েছে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ, যেটিতে তার কাজের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবই ফুটে উঠেছে, তার ফলে বর্ত্তমানে তার সব বিরক্তি গিয়ে পড়েছে ঝাঁটাটির ওপর এবং কোন না কোন সময়ে তার ঐ বিরক্তি তার পারিপার্শ্বিককেও বিব্রত ক'রে তুলবে।

সাধারণ জীবনে এমন কতকগুলো কাজ আছে যাকে মানুষ ঘৃণা করে ছোট কাজ ব'লে কিন্তু সেই কাজগুলোই হয়তো ঈশ্বরের বহুমুখী কর্ম্মধারার মধ্যে ক্ষুদ্র আকারের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির বিরাট একটি অংশকে রক্ষা ক'রছে। সহজ সুলভ আলো বাতাসের মতই সেই সহজ প্রাপ্য কাজগুলি না হ'লে মানব সমাজ হয় তো কালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তাই ছোট কাজ ব'লে কোন কাজকে অবহেলা করা উচিৎ নয়। এ জগতে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। সমাজের ধনমুণ্ডের অধিকর্ত্তা রাজা—তাঁর দেশের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাতে অবহেলা করলে যে ক্ষতি হবে, ঠিক অনুরূপ ক্ষতি হবে একটি ভাঙ্গী যদি তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করে। দুটি কর্ম্ম অবহেলাই সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কর্ম্মের ব্যাপক ক্ষেত্র পাশ্চাত্য এ বিষয়ে দেখা যায় বেশ সচেতন। শোনা যায় তারা কোনও কাজকে ছোট ব'লে ঘৃণা করে না। যার ফলে সেখানে ঝি চাকরের প্রয়োজন এ দেশের মত নেই বললেই চলে। প্রত্যেকেই নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত সে যাইহোক, এছাড়া যা এদেশের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে অসম্মানজনক, যথা জুতা বিক্রী করা, খবরের কাগজ বিক্রী করা, মোট বওয়া ইত্যাদি এসব কাজও তারা করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। কাজেই কর্ম্ম জগতে তারা ভগবৎ-কৃপা প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছে এবং সে জগতে তারা প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দেশেও সমাজ-নেতারা এসেছেন, উপদেশ দিয়েছেন ছোট কাজকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে, কিন্তু ব্যাপক ভাবে তাকে গ্রহণ করা হয়ে উঠছে না ব্যাপক সমাজ চেতনার অভাবে।

শ্রীশ্রীমা বলতেন—কর্ম লক্ষ্মী, কাজকে অবহেলা কোরোনা। প্রত্যেকটি কাজে তিনি চেয়েছেন শ্রদ্ধাপূর্ণ সযত্ন একটি স্পর্শ যাতে কাজটি সত্য সত্য লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কেউ হয়তো অযত্ন করে খেতে দিয়েছে তাকে তিরস্কার করেছেন, বলেছেন—অমন করে খেতে দিলে কি মানুষের তৃপ্তি হয়? তোরা না পারিস আমায় দে আমি দিচ্ছি। তারপর নিজে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন মমতা জড়ানো আগ্রহে কাছে গিয়ে ক্ষুধিতকে আহার দিতে হয়। তরকারীর খোসাটাও অযত্ন ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া পছন্দ করতেন না। বলতেন, তরকারীর খোসাটাও সুন্দর প্রাণ্য, ওটিও যত্ন ক'রে তার মুখে তুলে দিতে হয়।

শ্রদ্ধা হৃদয়ের এমনই একটি বৃত্তি যেটি থাকলে হৃদয় আপনিই বৃথা অভিমানের আড়াল ঠেলে সংকোচহীন হয়ে ওঠে। এই শ্রদ্ধাই মনকে গ্রহণশীল ক'রে তোলে। যেখানেই অশ্রদ্ধা, বুঝতে হবে সেখানেই বৃথা অহংকারের বিরাট বাধা মনকে করে রেখেছে সংকুচিত দ্বিধাগ্রস্ত এবং এই অশ্রদ্ধাই মানুষকে ছোট-বড়র ভেদ করতে শেখায়, কাজে অবহেলার ভাব জাগিয়ে তোলে। এই যে বর্তমানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা—এর একমাত্র কারণ ছোট বড় কাজের মধ্যে একটা চরম অশ্রদ্ধার ভাব গোপন। বিভিন্ন কাজের মধ্যেই বিভিন্ন সমাজের সৃষ্টি। কিন্তু সেখানে কোন বিভেদই সৃষ্টি হ'ত না যদি জাতিগত সংস্কার হিসাবে এই শ্রদ্ধা প্রত্যেকটি মানুষ মনে স্থান পেতো। নিজের কাজের প্রতি, পরস্পরের কাজের প্রতি একটি বিনম্র শ্রদ্ধা থাকলে সেখানে ছোট বড় জাত বা ছোট বড় কাজের কোন প্রশ্নই উঠবে না। বিভিন্ন কাজে ভরা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটি সাম্য মৈত্রীর সম্পর্কই গড়ে উঠবে।

সর্বোপরি এই শ্রদ্ধা আবার যদি ঈশ্বরীয় ভাবযুক্ত শ্রদ্ধা হয় তাহ'লে প্রত্যেকটি কাজই হবে ভগবৎ সাধনার অনুকূল। বহু গোপন সাধকের জীবন বৃত্তান্ত থেকে এর প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। গুরু নির্দেশিত পথে সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর উপযুক্ত হীন কাজের মধ্যে নিজেদের সারাটি দিন নিয়োজিত করে রেখে তাঁরা লাভ করেছেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-প্রাপ্তি। ভক্ত রুইদাস, ভক্ত কবীর এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভক্ত রুইদাস মুচি, কবীর জোলা। বলা বাহুল্য, তাঁরা তাঁদের বৃত্তি বজায় রেখেই জগৎ-বরেণ্য হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ যুগের রসিক মেথরকেও আমরা বাদ দিতে পারি না, যাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাশীষে ধন্য করে বলেছিলেন—যে কাজ করছিস মন দিয়ে সেই কাজ ক'রে যা, মা'র কৃপা পাবি। সেই ঠাকুরের সেই পরম বাণীটিকেই জীবনের পাথেয় বলে ধরে রেখেছিল। আর কোন সাধনাই তার ছিল না কিন্তু তার জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে তার সেই হীন হীন জীবনের যে পরিণতিটি আমরা দেখলাম তাতো নিরন্তর জগন্নারায়ণ কোন সাধকের তুলনায় কোন অংশেই ন্যূন নয়, মহাসাধকের মতই সেও জীবন মৃত্যুর মোহনায় দাঁড়িয়ে নিবিড় ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছে। শ্রীশ্রীমার বাণীর তাৎপর্য তার জীবনে কি মূর্ত হয়ে ওঠেনি? তাই মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার ঘুম যখন মনের বেদান্তকে ঘরে আনার ঘুম, তখন সে কর্মকে ঈশ্বরমুখী শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করাই শ্রেয় নয় কি? তাহ'লে ছোট-বড়র ভেদ মুছে গিয়ে কর্ম হয়ে যাবে ভগবৎ সাধনার এক একটি পথ এবং শ্রীমার বাণী সার্থক ক'রে সে কাজ হবে দিব্যতম ও সাকল্যশ্রীমণ্ডিত।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি

[সম্পাদকীয়—স্বামী নীলানন্দ]

ঊনবিংশ শতক বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের যুগ। এ যুগে যে সভ্যতার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটেছিল, তার অন্যতম দিক হল নারী-জাগৃতি। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ ক'রে বাংলা দেশের সকল শিক্ষিত মানুষ অনুভব করেছিলেন যে, শক্তির অভ্যুদয় না ঘটলে জাতির উন্নতি কোনদিনই সম্ভব হবে না। রাজা রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ-প্রবর্তন—আধুনিক ভারতবর্ষে নারী-জাগৃতির প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাদের ব্রাহ্মসমাজে মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতা দান, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির কাব্য-সাহিত্যে নারী জাগরণের স্ফুরণ সব কিছুই প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার পুনর্জাগরণের শুভ সূচনা করে। অনেকে হয়তো এ জাগরণকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাব বলতে পারেন। তবে একে পুরোপুরি পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাব না বলে পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংঘাতে আর্য-সভ্যতার পুনরভ্যুত্থান বলা সঙ্গত হবে।

ঠিক এই যুগেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণকে সম্পূর্ণতা দান করলেন। ধর্ম ব্যতীত কোন জাতির সভ্যতা চির-স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। সুতরাং নারী জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত না ধর্মে অধিকার পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে না—এ সত্যটা শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভব করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। প্রাচীন আর্য-যুগে যে পুরুষের সঙ্গে সর্ববিষয়ে নারীর সমান অধিকার ছিল তা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশী শাসনের ফলে চলেছে হাজার বছরের অন্ধকারময় যুগ। হিন্দু জাতি নারীকে রক্ষা করতে গিয়ে বাইরের জগতে নারীর স্বাধীনতা খর্ব ক'রে তাকে বন্দিনী ক'রে রেখেছিল গৃহাভ্যন্তরে। আর্য-যুগে বিবাহিতা নারীর আরেক নাম ছিল সহধর্মিণী কারণ তাঁরা স্বামীর সঙ্গে সমান ধর্মাচরণ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বহু যুগ পরে নারীর সহধর্মিণী নামকে সার্থক করলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণিকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস আমাদের কাছে সুবিদিত। শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় শক্তি বা শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী। তাঁর সাধনা-শক্তি ও আশীর্বাদে আজও এই বিংশ-শতকের অপরাহ্নে আমরা সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্ত-অভক্ত সকলেই জীবন-আয়ু ভোগ করছি। বিংশ শতকের ভগিনী নিবেদিতা, পতিব্রতার শ্রীশ্রীমা, আমাদের প্রধান মন্ত্রী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজী সকলেই শ্রীশ্রীমার উত্তর সাধিকা। শ্রীশ্রীমার জন্মতিথিতে তাঁর কাছে কেবল এই প্রার্থনা জানাই—তিনি আমাদের সকলকে শুভ বুদ্ধি দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাকাব্য

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এমনি ক'রে কথায় কথায় স্নানের ঘাটে
দাঁড়ান ঠাকুর শীকর ঝোরা সজল বাটে
ছলকে ওঠে লহরগুলি
ভিজিয়ে জটা চরণধূলি
প্রভুর সাথে লালজী নামে ঢেউয়ের বুকে
মেঘের ছায়া পদ্মে দাঁড়ায় গগন নাটে।

জলে নেবেই মস্তি ছেলে আর কি মানে
ছুড়লো কাপাই মিঠেল হাসির কলতানে
যতই প্রভু আদর ক'রে
করেন মানা দুহাত ধ'রে
ঘুষ্টুমি তার ততই বাড়ে—কচি মুঠে
জল ছিটিয়ে হাসছে চেয়ে প্রভুর পানে।

প্রভুর নাওয়া সায় হ'ল তো তবুও হায়
জল ছেড়ে সে কোনমতেই উঠতে না চায়
বলেন প্রভু লক্ষ্মী সোনা
শীতল জলে আর থেকো না
ঠাণ্ডা লেগে কি যে হবে ভাবতে নারি
তোরে নিয়ে পড়েছি আজ একি রে দায়।

অবুঝ ছেলে শুনবে না আজ কারো কথা
বেড়েই চলে কাপাই ছোড়া চঞ্চলতা
হঠাৎ প্রভু বিষম কোপে
জলেই তারে ধরেন চেপে
একটু ক্ষণেই শিউরে ওঠে কোমল তনু
চমকে ওঠে প্রভুর বুকের ব্যাকুলতা।

তড়িৎ বেগে সোনার চাঁদে বক্ষে চাপি
কাঁদেন প্রভু কচি মুখে মুখটি রাখি
হায় রে আমি কেমন ক'রে
ধরেছিলাম ডুবিয়ে তোরে
কচি প্রাণে আঘাত দিলাম হায় রে বিধি
পাষাণ হতে আর কি আমার রইলো বাকি।

সেই আদরে জানি না হায় কেমন করে
মায়ের ঠোঁটে সোনার হাসির কমল ঝরে
আদুল তনুর ভিজে বাসে
বাতাস যেন লুকিয়ে হাসে
ঘুমুলি পাখায় ছন্দ তুলে চন্দনা কয়
সূর্য্যমুখী প্রহর আমার সেল ভরে।

এমনি কত মিষ্টি মধুর স্নানের বেলা
যায় গো কেটে মৌ-মিতালির জমিয়ে খেলা
কখনও বা লালজী এসে
বায়না কত আমায় হেসে
কখনও বা বলল কিছু খাও না খেতে
হয়তো তখন শূন্য পড়ে ভোগের থালা।

শিকা'র 'পরেও হয়তো বা নাই মিষ্টি মিঠাই
ভাবেন প্রভু কি দেব হায় ভেবে না পাই
এদিক ওদিক খুঁজতে তবু
মিললো কিছু খই-ই তবু
সেই ক'টি খই দিলেন প্রভু লালজীরে তাঁর
ভাবেন মনে শান্ত হয়ে থাকুক তো ভাই।

সেইটুকুতেই চাঁদমুখে চাঁদ কতই খুশী
ছোট্ট মুঠে তুলতে গিয়ে ছড়ায় বেশী
　　নন্দিত সেই শ্যামল তনু
　　চুঁইয়ে ঝরে আলোর রেণু
ললাট চুমা গড়িয়ে পড়ে গণ্ডগাল বেয়ে
　　দ্বিগুল পায়ে চূড়ার কুসুম পড়ছে খসি।

হঠাৎ দুলাল শিউরে যেন কেঁদেই ওঠে
ত্রস্তে প্রভু শুধান বাঁধি বক্ষ পুটে
　　কি হ'ল বাপ কিসের তরে
　　কাঁদিস কেন এমন ক'রে
লালজী দেখায় তুলতুলে তার কোমল সে জিভ
　　কিসের যেন আঁচড় লেগে গেছে কেটে।

উচ্চস্বরে কেঁদে ঠাকুর বলেন রে হায়
খই-এ বুঝি ছিল রে ধান দেখিনি তায়
　　কোমল সেদব ও চাঁদমুখে
　　দিলাম সে খই পাষাণ বুকে
একটু দেখে দিলাম নাকো হায়রে কপাল
　　নিদয় হিয়া ভাঙ্গল নাকো একি গো দায়।

যে মুখে মা কৌশল্যা দিতেন তুলে
ক্ষীর নবনী,—সেই মুখে হায় মনের ভুলে
　　দিলাম তুলে এমন আহার
　　বলতে উছল নয়ন ধার
ঘোমার ঢেউয়ে উঠলো যেন কেঁদিয়ে আরো
　　বক্ষ ফোড়া কান্না জাগে কুলে কুলে।

কম দেখায় দেখতে পারি নয়ন ভরে
সোহাগ সোনার গেদব ছোঁয়ায় কেমন ক'রে
　　ভুড়িয়ে গেল জিভের ক্ষত
　　হাসলো যাদু মধুর মত
ঠিক ক্ষীরের বাসনা যেন সেই হাসিতে
　　রইলো আঁকা পরের দিনের ভোগের তরে।

※

বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ

অরিন্দম দাশগুপ্ত

মহর্ষি—
তোমার শাশ্বত বেদীতলে,
যে সাম্যের সুর
　　আজো ভাসে
　　তারই সায়াহ্নে বসি;—
অনন্ত নক্ষত্র কাল
　　শুধু দীপ্যমান।

সেই সুরের মহাসম্ভোগে—
　　হে মহর্ষি
এই বাণী শুনি
　　অনন্ত নক্ষত্র কাল ভেসে যায়
　　'মহা ত্যাগে'র মাঝে

একটি ছোট্ট প্রশ্ন

শ্রীযুগেন্দ্র দুগড়

শ্রীঠাকুর চ'লে গেলেন মাত্র ছবিবার লীলায় তরী ভাসিয়ে। তরী পড়ল প্রচণ্ড সাইক্লোনের মুখে। শ্রীঠাকুরের ভক্ত তরুণ-ত্যাগী ছেলেরা দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে। বিরহ বহ্নির জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে তাদের তনুমন। দেহ ছেড়ে পাড়ি দিতে চাইছে সবাই ওপারের পানে। আর আমাদের মা! বিরহ বেদনায় হয়েছেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে ভূলুণ্ঠিত দেহের চতুষ্পার্শে, দহিত সঙ্গ কামনায় মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছেন দৃঢ় সংকল্প। সে রিক্ততা যে আর কেউ পারবে না ভরিয়ে দিতে! সে দেহ সে মন যে হারিয়ে গিয়েছে তাঁরই সত্তায়। আর বেঁচে থাকা যে অসম্ভব! সেই চরম ক্ষণে জননীর তৃষিত দু'নয়ন জুড়িয়ে মৃদু হাসির মধু ছড়িয়ে বঙ্কিম ভঙ্গে দাঁড়ালেন এসে শ্রীশ্রীঠাকুর। মধুর হ'তেও মধুর কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বললেন—তোমায় যে থাকতে হবে গো, আমার অনেক কাজ যে বাকী!

যাওয়া হ'ল না। স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়ী জননী স্বেচ্ছায় তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে করেছেন বিসর্জ্জন। শ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। শত দুঃখ শত জ্বালা শত লাঞ্ছনা সহেও থাকতে হ'ল অবোধ জীবের কল্যাণে তিল তিল ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। "মধুরের নিষ্ঠুর কথাও যে চির মধুর" আমাদের মায়ের লেখা 'জননী সারদেশ্বরী'র এই উক্তিটির মধুর বেদনাময় ভাবস্রোতনায় বুক নিঙরে ওঠে।

অসহ্য জ্বালায় অধীর হ'য়ে একোতির চিহ্ন দুটি বালা খুলে ফেলতে চাইলেন মা, তখনও ঠাকুর দিলেন বাধা! জননীর নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে মা'র দুটি হাত আপন হাতে ধ'রে বাণীতে অমিয় মাধুরী মাখিয়ে বললেন—আমি কি কোথাও গেছি গো, এই যেমন এ ঘর থেকে ও ঘর। ক্ষান্ত হ'লেন মা। কিন্তু ক্ষণেকের এই পাওয়ার মোহ কি ভরিয়ে দিতে পেরেছিল মা'র বুকের মরুসম অতৃপ্তি? শ্রীঠাকুরের দুটি মধুর কথার আড়ালে চিরদিনের বেদনার ইংগিতই ছিল লুকানো।

মা'র তখন বয়সও বেশী নয়। মাথার ওপর থেকে স্বামী চলে গেলে স্বভাবতঃই সন্তান হয় মায়েদের একমাত্র অবলম্বন। ছেলে যত ছোটই হোক্ না কেন, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা নিঃসঙ্কোচে পাড়ি দেয় উপল বিস্তৃত দীঘল পথে। বিশ্ব-জননীও নিলেন সেই অবলম্বন। কিন্তু শুষ্ক সমাজ-বিধানের অকরুণ চোখে সহায়হীন জননীর এই সম্বলটুকুও যেন সয়না। কামারপুকুরে নানান্ বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু হ'ল। বাক্যবাণে বিদ্ধ হ'লেন জননী। সব সইলেন নীরবে। সন্তানবর্গকে ধীরে ধীরে আশ্রয় দিলেন করুণাবিগলিত বুকে। টেনে নিলেন শ্রীঠাকুরের বিরহ-ব্যাকুল ছেলেদের। সবাই পেল জুড়োবার ঠাঁই, এমন কি আবদার পরিবেদনও বঞ্চিত হয়নি মা'র স্নেহ থেকে।

কিন্তু মা? সবাইকে শান্তি দিতে গিয়ে শুধু অশান্তিই নিলেন কুড়িয়ে। তাঁর তো জ্বলে যাবার জন্যই নেমে আসা! কিন্তু কি নির্ম্মম এই ধরার ধূলি! কত অবোধ এই মর্ত্তের মানুষ। অগণিত ভবি যুনি যাঁর জন্য যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে শরীরপাত করছে, সেই জগন্মাতা স্বয়ং যখন নেমে এসেছেন লীলার ছলে, তখন চেনার জগৎ তাঁকে চিনতে পারেনি।

লীলাময়ী মা'র আজ তিব্বত থেকে সুরু ক'রে সুদূর ইউরোপ আমেরিকা সারা বিশ্ব জুড়ে পূজার আসন পাতা হ'য়েছে। নগরে নগরে গ'ড়ে উঠেছে সারদামণির কতশত মন্দির আশ্রম। কিন্তু এই বিরাট মাতৃশক্তির মহান প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে হৃদয় বিদারী করুণ ইতিহাস।

ঠাকুর চলে যাওয়ার ঠিক পরেই প্রায় দু'বছরকাল ছেলেরা মা'র বিশেষ কোনও খোঁজই নেয় নি। তখন সবাই তীব্র বেদনার ভার বুকে নিয়ে ছিন্নছাড়া হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে সেখানে। কামারপুকুরের পরিবেশ মনোমত না হওয়ায় মাকে চলে আসতে হয় জয়রামবাটিতে নিজ পিত্রালয়ে। সেখানেও স্বস্তি ছিল না। পাগলী মামীর কাছ হ'তে মা পেয়েছেন অনেক কষ্ট—সারা রাত কেঁদেছেন, ঘুমোতে পারেন নি। একদিন তো পাগলী মামী ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে মাকে প্রহার করতে হয়েছিল উদ্যত। সে যাত্রা মা'র দেবশরীর রক্ষা করে মা'রই কোনও সন্তান। কিন্তু রাবু শুধু উদ্যতই হয়নি সত্যি সত্যি মা'র দেব অঙ্গে একটি তাড়ি বেগুন ছুঁড়ে কঠিন আঘাত করেছিল।

লীলার শরীরে নানা উপসর্গ ভোগ করেছেন মা দিনের পর দিন। দেব দেহ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে গিয়েছে। অথচ সেবা শুশ্রূষার তেমন কোনও ব্যবস্থা হয়নি। একদিন পুকুরের জলে দীর্ঘ প্রতিচ্ছবি দেখে মা খেয়ালের বশে প্রকাশ ক'রেছেন তনুত্যাগের ইচ্ছা। শ্রীঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। শ্রীদেহের অবস্থা শুনে ঠাকুর শুধু বলেছিলেন - ও আসবে আর চলে যাবে, কিছু করবে নি। মা'র শরীর সেবার সেরেছিল সিংহ-বাহিনীর মৃত্তিকা সেবনে।

উমা মায়ের মতই অশ্রুসজল দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সর্বহারিণী জননী শ্যামার সঙ্গে মা এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর-ধামে উদাসী শিবের দর্শন মানসে। নৌকো কূলে ভিড়লে মা একটি চরণ নামিয়েছেন তীরে, দ্বিতীয় চরণ তখনও নৌকার 'পরেই ছিল রক্ষিত। সেই মুহূর্তে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম কোথা হ'তে এসে মাকে অকারণ তীব্র ভৎর্সনা করতে সুরু করে। ঠাকুর অদূরে দাঁড়িয়ে অম্লান বদনে সেগুলি শুনেছেন, কোনও প্রতিবাদই করেন নি, বরং শ্রীমুখে ফুটেছে এক টুকরো মধুর হাসির রেখা। প্রিয়তমা কন্যাকে বুকে জড়িয়ে জননী শ্যামা ফিরে গিয়েছিলেন অপমানের বোঝা নিয়ে।

শ্রীঠাকুরকে মা করেছেন প্রশ্ন—তুমি চলে গেলে আমি কি ক'রে থাকব, আমি কিছুতেই পারবো না। শ্রীঠাকুর নিবিকার ভোলানাথের মতই ব'লে দিয়েছেন—কেন শাক বুনবে আর খাবে। একি খেলা বিশ্বনাথের বিশ্বজননীর সঙ্গে? যাঁর এতটুকু অমর্যাদায় হয়েছেন অতিমাত্রায় বিচলিত, যাঁর এতটুকুও অসুবিধায় হয়েছেন অত্যন্ত ব্যগ্র, সেবকদের করেছেন ভৎর্সনা, যাঁর ইচ্ছার এতটুকু বিরোধিতা হ'তে দেখে সভয়ে বলে উঠেছেন—আরে ওকে চটাস্‌নি, ও চটলে আমার সব যাবে, যাঁকে বলেছেন—ঐ মন্দিরের মা আর তোমাকে সত্য সত্য এক দেখি, তুমি আমার সাক্ষাৎ আনন্দময়ী, যাঁর চরণে পূজার অর্ঘ্যর সঙ্গে নিজের সর্বস্ব করেছেন অর্পণ; সেই মা'র প্রতিই ঠাকুরের এই নিষ্ঠুরালী আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের ধারণার অতীত।

বলতে গেলে মাকে শাক বুনেই খেতে হয়েছিল—গৃহস্থের বাড়ী ধান ভেনে, সুতো কেটে দিন চালিয়েছেন মা। জমিদারের খাজাঞ্চী মায়ের মাসোহারার দরুণ বরাদ্দ সাতটি মাত্র টাকাও যখন বন্ধ ক'রে দিল, স্বামী বিবেকানন্দ তখন ব্যাকুল হ'য়ে প্রতিবাদ করলেন—তারা যেন সেই সামান্য পাথেয়টুকু বন্ধ না করে। কিন্তু বিবেক-বাণীর অনুনয়ও ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন।

একদিকে ঠাকুরের আঘাত আর অপরদিকে জগতের অমর্যাদা, শুধু এই হয়েছে মা'র প্রাপ্য। শ্রীরামচন্দ্রের যুগে, শ্রীকৃষ্ণের যুগে, মহাপ্রভুর যুগে সব যুগেই দেখি জননীর এই বেদন-বিধুর লীলার চিত্র। যুগে যুগে জগজ্জননীর এই অসহ বেদনা বরণ করে নেওয়াই কি বিধিলিপি! ভাগ্যবিধাত্রীকেই প্রশ্ন করি—কেন তুমি নিজের ভাগ্যটি এমন ক'রে আনো?

নিবেদন

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল

মা ব'লে আর ডাকবো নাকো
মা নামে আর কাজ কি আমার
মা থাকতে মা-হারা হোলাম
মা সো তোমার এম্‌নি বিচার।

থাকবে ছেলে মায়ের কোলে
এই তো জানি সহজ কথা
এমনি আমার ভাগ্যলিপি
মা বোঝে না ছেলের ব্যথা।

মা মা ব'লে ডাকি কতই
ডাক প'শে না মায়ের কানে
আমি কেঁদে কেঁদে হোলাম সারা
মা তো না চায় আমার পানে।

ঢের হয়েছে আর কব' না
প্রাণের ব্যথা কাঁদায় ছলে
তুমি আপনি যদি না বোঝ মা
সাধ্য কি মোর বোঝাই ব'লে।

নীরব মুখে গভীর দুখে
রইবো পড়ে তোমার দোরে
জানি তুমি লবেই লবে
সোহাগ ভরে কোলে মোরে।

※

নমঃ শ্রীশ্রীসারদাদেব্যৈ

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র গুপ্ত

বন্দেঽহং সারদাং নিত্যং
জননীং সর্ব-সারদাম্
প্রকৃতিং পরমাং বিদ্যাং
স্নেহ-শান্তি-প্রদাং প্রবাম্।
শ্রীমতঃ রামকৃষ্ণস্য
শক্তিরূপা মহেশ্বরি,
কৃপয়া কুরু কল্যাণং
জগচ্ছান্তি-প্রদায়িকাম্।

※

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

১৯০৫ সন। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় সূচিত হয়েছিল সেদিন। লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দু'ভাগে খণ্ডিত করে যে প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন তারই মোকাবেলায় অরবিন্দ বরোদা ছেড়ে চলে এলেন বাংলায়। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে এবার ঘটল তাঁর সাক্ষাৎ ও সক্রিয় যোগাযোগ। এর পূর্বেও যে বাংলার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ বিযুক্ত ছিলেন তা নয়। ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার এবং ব্যারিস্টার পি. মিত্র প্রভৃতির সহযোগে বাংলার যুব সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে, স্বাধীনতার বাণী প্রচারকল্পে জন-সাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এবং দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে অরবিন্দ উদ্যোগী হয়েছিলেন আগে থেকেই।

বঙ্কিমের "আনন্দ-মঠ"-আদর্শে উদ্বুদ্ধ অরবিন্দই রূপ দিয়েছিলেন 'ভবানী-মন্দির' পরিকল্পনার।

প্রথমে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ [National Council of Education] পরিচালিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করলেন অরবিন্দ। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। অধ্যাপনা ছেড়ে যোগদান করলেন 'Bandemataram' ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনায়।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার লেখার মাধ্যমেই অরবিন্দ সর্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য। পুরনো নরমপন্থী কংগ্রেসী রাজনীতির পরিবর্তে দেশের সামনে তুলে ধরলেন এক বিপ্লবী ভাবধারা ও আদর্শ।

সংক্ষেপে, (১) পূর্ণ স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা লাভই আমাদের লক্ষ্য।

(২) স্বনির্ভর ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অসহযোগের মাধ্যমেই উক্ত অভীষ্ট লাভ করতে হবে।

(৩) আমাদের রাজনীতি হবে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক চুক্তির দ্বারা স্বাধীনতা লাভ নয়। ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করবে অধ্যাত্মচেতনা উন্মেষের মধ্য দিয়ে।

অরবিন্দের এই মৌলিক ও অনন্যপূর্ব্ব চিন্তারই ভবিষ্যৎ মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ভারতীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার করেছিলেন অরবিন্দ। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় আর মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক অরবিন্দের সমসাময়িক ও সহযোগী ছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের পুরাতন পন্থী ও নবীন পন্থীদের মধ্যে যে মতবিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাতে অরবিন্দের নেতৃত্বাধীন শেষোক্ত দলই জয়লাভ করেছিল। একটা প্রগতিশীল, প্রাণবন্ত ও বিপ্লবী জাতীয় সংগ্রামে সেদিন থেকেই কংগ্রেসের প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল।

তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার অরবিন্দের বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যে সুনজরে দেখবে না তা বলাই বাহুল্য। রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন 'বন্দেমাতরম্'-সম্পাদক অরবিন্দ। কিন্তু আইনগত প্রশ্নে ছাড়া পেলেন। এই সময়েই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত অরবিন্দ-প্রশস্তি:

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু,
হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি
তুমি।
তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।
• • •
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান
আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

এর অল্প কিছুদিন পরেই আরও কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। ১৯০৮ সন। মজঃফরপুরে বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে নিহত হলেন দুইজন ইংরাজ মহিলা। ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু। বিচারে ফাঁসী হল ক্ষুদিরামের। গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় কলিকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলার মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িতে আবিষ্কৃত হল বোমা-পিস্তল-সঞ্চিত বিপ্লবীদের আড্ডা। ধরা পড়লেন অরবিন্দানুজ বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র ও আরও অনেকে।

অরবিন্দ সে সময় গ্রে ষ্ট্রীটের একটা বাড়িতে সবেমাত্র সপরিবারে উঠে এসেছেন। গভীর রাত্রি। সাদা ও কালামুখো এক বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী হানা দিল গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়িতে। অরবিন্দ তখন ঘুমুচ্ছিলেন। স্নান অবস্থাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। হাতে পরিয়ে দেওয়া হল হাত-কড়া। সঙ্গী অবিনাশ ও অপর একজনের হাতে হাত-কড়া ছাড়াও কোমরে বাঁধা হল দড়ি। পুলিশের চক্ষে এঁরা ছিলেন এতই ভয়ঙ্কর এতই সাংঘাতিক। তারপর শুরু হল বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা। বৎসরাধিককাল চলল এই বিচার। বিচারে খালাস পেলেন অরবিন্দ। তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে অপূর্ব বাগ্মিতা, আইন-কানুনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতার পরিচয় দিয়ে অক্ষয় যশ ও কীর্তি অর্জন করেছিলেন। সওয়ালের শেষে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দকে অভিহিত করলেন দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার গুরু এবং মানব-প্রেমিক রূপে (The poet of patriotism, the Prophet of Nationalism and the lover of humanity)। আর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, একদিন শুধু এ দেশেই নয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে অরবিন্দের বাণী। চিত্তরঞ্জনের এই কথা অদূর ভবিষ্যতেই সার্থক প্রমাণিত হয়েছিল।

এদিকে কারাগারে নির্জন বাসকালেই অরবিন্দের অন্তর জগতে ঘটে গেছে এক বিরাট পরিবর্তন। তিনি লাভ করেছেন যোগসিদ্ধি। অন্তরের নারায়ণ হয়েছেন জাগ্রত। বিশ্বভুবন আজ নারায়ণময়। জেলের প্রাচীর, প্রহরী, আদালত কক্ষ, বিচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সব কিছুই আজ এই অন্তর্বিলয়ী যোগীর কাছে একান্ত বাহ্য। দুঃখ, সুখ, আশঙ্কা, আতঙ্ক আজ কিছুই তাঁর মনকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারে নি। পরম ঔদাসীন্যে যোগীবর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করলেন অরবিন্দ। ইতোমধ্যে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার ঘটেছে অকালমৃত্যু। আবার পূর্ণোদ্যমে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অরবিন্দ। কর্মবন্ধন শেষ হতে আরও সামান্য কিছু বিলম্ব হবে। নূতন করে প্রকাশ করলেন ইংরেজীতে "কর্মযোগিন" এবং বাংলায় 'ধর্ম' পত্রিকা। লেখনীর মুখে অজস্র ধারায় নিঃসৃত হতে লাগল নব নবোন্মেষশালিনী সত্তার আত্মোপলব্ধির বাণী। ক্রান্তদর্শী ঋষির কণ্ঠোচ্চারিত প্রতিটি বাণীই উত্তরকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অরবিন্দ বলেছিলেন ভারত স্বাধীন হবেই। এ বিধাতার অমোঘ নির্দেশ। অবিচল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অরবিন্দ সেদিন যা বলেছিলেন সমসাময়িকদের কাছে তা নিছক কল্পনা ও স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি।

পরবর্তীকালে অরবিন্দ বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র-শক্তির চূড়ান্ত জয় অনিবার্য। ঠিক যে সময় অরবিন্দ এ-কথাকটি বলেছিলেন, সে সময়টা ছিল হিটলার ও দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীর শীর্ষ পরাক্রমের সময়। কেউ ভাবতেই পারে নি যে, প্রায় পর্যুদস্ত মিত্রবাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাই অরবিন্দ সেদিন হয়েছিলেন ব্রিটিশবিমুখী জনগণের বিরাগভাজন।

তৃতীয় উক্তি : কি ভাবে জানি না, কিন্তু ভারত পাকিস্তান আবার যুক্ত হয়ে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধবাক্ ঋষি। তাঁর এই বাণীর সার্থকতার ইঙ্গিত আজ ক্রমশঃই যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে নয় কি?

(ক্রমশঃ)

রসো বৈ সঃ

আবৃত্তি
সাবলাপুরী

বাল্যের সেই সোনালী স্মৃতির মুকুরে ফুটে ওঠে শ্রীঠাকুরের আবৃত্তিরত আরেকটি ছবি—সেও আমাদের পড়ানোর সময়ে—আশ্রমের পিছনের বাগানটায় তখন করবী গাছের পল্লব শাখা ভরে গুচ্ছ গুচ্ছ করবী ফুল দুলছে, সদ্য ফোটা গোলাপ স্তবক ঘিরে উঠছে ভ্রমরের গুঞ্জন আর শ্রীঠাকুর বসেছেন মাধবী বিতানের নীচে 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন আর মানে বলে দিচ্ছেন—আমরা অবাক হয়ে শুনছি আবৃত্তি ....

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি
অনাথপিণ্ড কহিল অযুত নিনাদে।
...
সাধু কহে, শুন মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় . শ্রীধার
সব ধর্ম মাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।
কৈলাস শিখর হতে দুরাগত
ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মতো
সে বাণী মন্ত্রিল সুখ-তন্দ্রাগত
তখনে॥

ফেলি দিল পথে বণিক ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতন কণিকা
কেহ কণ্ঠহার মাথার মণিকা
কেহ সো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে
ভিক্ষে কহে, 'ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহো সো।'
সনে ভূষণে চাকি সেল ধূলি
কনকে রতনে খেলিল বিজুলী
সন্ন্যাসী হুকারে সরে শুক ঝুলি
সঘনে—
ওগো পৌরজন করো অবধান
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান
দেহো তাঁরে নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান
বচনে।

আবৃত্তির মাঝে ভাবাবেশ সংবরণ করে শ্রীঠাকুর বললেন, "অনাথপিণ্ডদ ভিক্ষু কোন দান গ্রহণ করলেন না—কেন না কেউই নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করতে পারল না, ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাই অনাথপিণ্ড নগর শেষে অরণ্য পথে পা বাড়ালেন"—কথাগুলি বলে শ্রীঠাকুর আবার আবৃত্তি করে চললেন—

দীন নারী এক ভূতলাশয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ
সে আসি নমিল সাধুর চরণ
কমলে।

এর পরের লাইনগুলি আবৃত্তি করতে করতে অনুভূতিসহিল হয়ে উঠল শ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বর, নীল উলটলে চোখ বেয়ে ঝরে পড়ল প্রেমাশ্রু, পড়ে চললেন—

অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে

ভিক্ষু উর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ
কহে ধন্য মাতঃ করি আশীর্ব্বাদ
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।
চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সংঘিতে বুদ্ধের চরণ আলোকে
পুলকে।

আবৃত্তি শেষে শ্রীঠাকুর বললেন,

'দেখ রাজাদের অত দানের চেয়ে ভিক্ষুণীর একমাত্র ছিন্নবাস শ্রেষ্ঠদান বলে গ্রহণ করলেন কেন - এর মানে আছে—নারীর লজ্জাই ভূষণ, সেই লজ্জার কথাও না ভেবে ভবিষ্যতও না ভেবে যথাসর্ব্বস্ব ওই সে ছিন্নবাসখানি খুলে নিজেকে অরণ্য আড়ালে আবৃত রেখে দিয়ে দেওয়া এইটিকেই কবি শ্রেষ্ঠ দান বলে বর্ণনা করলেন। আর ভগবানের জন্য অষ্টপাশ ত্যাগের কথাও তো শাস্ত্রে আছে।

কৈশোর ও বাল্যের সন্ধিক্ষণে সেই দিব্যাতিদিব্য কণ্ঠের কবিতা-আবৃত্তি-শ্রবণ, বুঝিয়ে দেবার সে অসাধ ধৈর্য্য, অদ্ভুত শক্তিযুক্ত কাব্য প্রেরণা দান এই সবের ফলেই তো শরৎপুরী, অর্চনাপুরী প্রথম শ্রেণীর দিব্য কবি হতে পেরেছে। শুধু ওরাই নয়—বিমলদা, পুতুল, গায়ত্রী এরাও তখন থেকেই সুরু করেছিল কবিতা রচনা করতে। আরাধনা, মহামায়া, অরুণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ এদেরও পরবর্ত্তীকালে রচনাশক্তি সেও তো শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্য লাভের ফল। ঠাকুর যে কবি-স্রষ্টা।

মনে পড়ে বরানগর আশ্রমের প্রথম দিকের কথা —শ্রীঠাকুর তখন প্রতিদিন গঙ্গাতীরের উঠানে এসে বসতেন উন্মুক্ত আকাশের তলায়—সেখানে বসে দীর্ঘ সময় ধরে কোনদিন কালীকীর্ত্তন করতে করতে ভাবে ডুবে যেতেন, কোনদিন নিবিড় ধ্যানে সমাহিত হয়ে

যেতেন কোনদিন বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

মনে পড়ে এমনি একটি জ্যোৎস্নাবিধুনী রাত্রির কথা—শ্রীঠাকুর বসেছেন আশ্রম আঙ্গিনায়—চাঁদের মহুয়া পানে প্রকৃতি যেন নেশায় বিভোর—বড় নিস্তব্ধ, বড় রহস্যঘন—আর সেই নেশাধরা চাঁদের আলোয় বসে গঙ্গার জলধারার দিকে উদাও দৃষ্টি মেলে আবৃত্তি করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা—

কথা কও, কথা কও,
　　অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
　　কেন বসে চেয়ে রও
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
　　তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
　　মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
　　কলকল ভাষ নীরব তাহার
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,
　　তুমি তারে কোথা লও?

শ্রীঠাকুরের আবৃত্তির মাঝে কণ্ঠের মধ্যে কখনও ফুটে উঠে গভীর আহুতিভরা সুর—কখনও নির্লেপ উদাস্ত গাম্ভীর্য্য।

জ্যোৎস্না ধোওয়া বরতনু—আঁচল নড়ছে দক্ষিণায়, আবৃত্তি করে চলেছেন—

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
　　স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
　　কথা কও, কথা কও।

শ্রীঠাকুরের এই আবৃত্তি করার কথা মনে পড়ার সঙ্গে আরও মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের অপার স্নেহ ও করুণার কথা, মনে পড়ে অযুত ভক্তের সাথে কত না মঙ্গল কথা—বাল গোপালের মত লীলাচঞ্চল দেহের কত না দিনের চপলতা, মনে পড়ে কত লীলা সমাধি, কত স্মিতহসিত বিলাস, কত কত! অশ্রুর বন্যার সঙ্গে বুক চিরে জাগে ডাক—রাত্রির গভীরে নির্বাক নিথর মূর্তির দিকে চেয়ে মনে হয় সেই করুণাময় এখন এত নিষ্করুণ কেন? মানুষের মত দেহ এখন না থাকলেও তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান—তবে এখন এত নীরব কেন? মাথা কুটে বুক ভেঙ্গে সেই স্বর্ণিম অতীতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে। কবিগুরুর মত আমাদেরও বুক ভেঙ্গে জাগে।

কথা কও, কথা কও
সোনালী অতীত—ত্রিকাল বিলাসী
অচেতন তুমি নও
কথা কও, কথা কও।
করুণা প্রেমের ঘন মূর্তিতে
আবার এসে দাঁড়াও
　　কথা কও, কথা কও।

(ক্রমশঃ)

※

পরলোক ও পুনর্জন্ম প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী শিবানন্দ

(১২)

পূর্ব সংখ্যায় আমরা প্রেতাত্মার স্লেট-লেখন নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মিঃ কিলারের সাথে বসে গোস্টেন মহারাজের আত্মার নিকট হতে চারটি ভাষায় লেখা পেয়েছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে গত সংখ্যায় আলোচনা হয়েছে। প্রেত-তত্ত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ গোস্টেন মহারাজের লেখা স্লেটখানি নিজের কাছে অতি সযত্নে রেখে দেন। এখনও স্লেটখানি বেদান্ত মঠে রক্ষিত আছে। এই সামান্য ঘটনা হতে বোঝা যায় যে, তিনি প্রেততত্ত্ব বিষয়কে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণিত করবার জন্য কতদূর যত্নশীল ও সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর রচিত 'মরণের পারে' গ্রন্থে ১৮৩ পৃষ্ঠায় তিনি গোগানন্দ মহারাজের লিখিত স্লেট-লেখনীর একটি আলোকচিত্রও দিয়েছেন। প্রেততত্ত্ব বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করবার জন্য স্বামীজী মহারাজ আর একটি বৈঠকে গোস্টেন মহারাজকে সশরীরে দেখা দেবার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত অভেদানন্দ মহারাজকে নিরাশ হতে হয়। কারণ গোস্টেন মহারাজ শরীর ধারণ করতে রাজী হলেন না। তবে আমেরিকায় থাকতেই গোস্টেন মহারাজ একটি টিনের চোঙার মধ্যদিয়ে বাংলায় তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন। অভেদানন্দ মহারাজ প্রেতবৈঠকে বিদেহী আত্মার অদৃশ্য হতে মূর্তি অঙ্কনও দেখেছিলেন। বলরাম বাবুকেও তিনি কয়েকবার আমেরিকায় দেখতে পান। এক বৈঠকে বলরামবাবু সশরীরে উপস্থিত হয়ে স্বামীজীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এ বিষয়ে স্বামীজী লিখছেন, বলরামবাবু আমায় আশীর্বাদ করার পর কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। স্বামীজী এক মৃত নাবিকের আত্মাকে অন্ধকারে হাতড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কি চাও। মৃত নাবিকটি উত্তরে বলে, "আমি ঠিক জানি না, তবে আমি সমুদ্রে ডুবে মরেছি। আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন শান্তি পাই।" স্বামীজী আশীর্বাদ করতেই সে হাসিমুখে বাতাসে মিলিয়ে গেল। লাটু মহারাজের কণ্ঠস্বরও অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় থাকতে শুনে ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন কে যেন কালী! কালী! বলে ডাকছে, কিছুই তিনি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'কে আপনি?' উত্তরে শুনলেন, আমি লাটু, তোমায় দেখতে এসেছি। এর কয়েকদিনের মধ্যে কেম্‌ব্রিজে খবর পেলেন যে, লাটু মহারাজ দেহ রেখেছেন। এছাড়াও তিনি গিরিশবাবু ও ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তদেরও অজানা অনেক মৃত আত্মাদের দর্শন করেছিলেন। তিনি বহু প্রেতবৈঠকে শক্তিশালী মিডিয়ম দ্বারা বিদেহীদের স্থূল দেহ ধারণ দর্শন করেন ও তাদের সম্বন্ধে নানাভাবে গবেষণাও করেন। তিনি আমেরিকার প্রেতবৈঠকে যোগদান করে বিদেহী আত্মারা যে মিডিয়মের এক্টোপ্লাজমের সাহায্যে রক্ত মাংস গঠিত স্থূল অনুরূপ দেহ ধারণ করে কিছুক্ষণের জন্য জগতে আবির্ভূত হতে পারেন এগুলি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এক্টোপ্লাজমের সাহায্যে মৃত আত্মারা যে স্থূল দেহের অনুরূপ দেহ ধারণ করতে পারেন তার প্রমাণস্বরূপ বিশেষ কয়েকখানি আলোকচিত্র তাঁর 'মরণের পারে' গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। এই সকল আলোকচিত্রে মিডিয়মের দেহের এক্টোপ্লাজমের সাহায্যে শুধু পূর্ণাবয়ব মানব দেহই যে প্রেত-আত্মারা ধারণ করেছেন তা নয়, অনেকের শুধু মুখমণ্ডল মাত্র মানব আকার ধারণ করেছিলো। বৈঠকে যোগদানকারী অনেকেই এদের দেখে নিজেদের আত্মীয় বলে চিনতে পেরেছিলেন। বিদেহী আত্মার জড়দেহ ধারণ সম্পর্কে ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রীচে অনেক কথা বলেছেন

ও বহুলোকে তিনি মৃত মানবকে সাময়িকভাবে দেহ ধারণ করতে দেখেছেন। তিনিও ঠিক স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মত বলেছেন, 'A living being or living matter formed under our eyes .. a new human being ! This is surely the climax of marvels.' "একটি জীবন্ত সত্তা বা জীবন্ত বস্তু আমাদের চোখের সামনেই গঠিত হ'ল। অলৌকিক ব্যাপারের এ এক চরম পরিণতি।" মিডিয়মের সাহায্যে প্রেত আত্মার অস্থদেহ-ধারণ আজকাল আমেরিকান পরলোক তত্ত্বানুসন্ধানীদের কাছে অতি সাধারণ ঘটনা।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ইংরাজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার আর্য্য সমাজ হলে পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। দারভাঙ্গার মহারাজ ছিলেন এই সভার সভাপতি। অমৃতবাজার পত্রিকার পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা আরম্ভ হবার অনেক পূর্বেই পণ্ডিত, মনীষী ও বিদ্বান জনতায় সভাকক্ষটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সভাপতি দারভাঙ্গার মহারাজ অভেদানন্দ মহারাজের পাশ্চাত্যের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করে তাঁকে পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই বিদগ্ধ জনতার সম্মুখে পরলোক সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি পরলোক তত্ত্বের গবেষণা আমেরিকায় কিভাবে আরম্ভ হয় এবং প্রেততত্ত্ব অনুশীলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রেততত্ত্ব প্রথম আমেরিকায় সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে অন্য পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুদীর্ঘকাল আমেরিকায় থেকে প্রেততত্ত্ব অনুশীলনের কাজে যুক্ত থেকে তিনি আমেরিকার অনেক প্রেত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি এখানে বলেন হার্ভার্ডের মৃত অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স্, অধ্যাপক মারার্স ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মনীষীদের অশরীরী আত্মার দর্শন তিনি লাভ করেন। তিনি প্রেতাত্মার জীবনের বিচিত্রতা সম্বন্ধে এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন মরণের পর মানুষ প্রেত জীবনের নানা স্তর অতিক্রম করে আপন কর্মানুসারে একটি স্তরে যায়। যারা এ জীবনে অন্যায় ও অসৎ কাজ বেশী করে তারা যায় অন্ধকারময় দেশে ও ভোগ করে নানা দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা। যারা এ জগতে সৎকর্মানুষ্ঠান করে তারা মৃত্যুর পর উন্নত আলোর স্তরে যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এরা মৃত্যুর পর সদ্গতির অধিকারী হয়। আমেরিকায় থাকাকালীন প্রেতাত্মাদের ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধে তাঁর এক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিবরণও তিনি এ সভায় ব্যক্ত করেন। ঘটনাটি যেমন অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর। প্রেত-জগতে প্রচলিত সাধারণ ঘটনার সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না বলেই কৌতূহলী পাঠকদের জন্য ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হল।

তিনি বললেন আমেরিকায় এই ঘটনাটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এক প্রেতবৈঠকে একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি গ্রামোফোন বন্ধ একটি টেবিলের উপর রাখা হল। ঘরের আর এক কোণে কিছু গন্ধক মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের জানালা দরজাগুলি ভাল করে বন্ধ করা ছিল। বৈঠক আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনের বাক্সটা শূন্যে উঠে গেল। যন্ত্রটি ঘরের ছাদ স্পর্শ করল এবং পাখীর মতো ঘরের চার কোণে ঘুরতে লাগল। গ্রামোফোনের একটি নির্দ্দিষ্ট গান যা বাজান হচ্ছিল শ্রোতারা তা পরিষ্কার শুনেছিলেন। অকস্মাৎ গ্রামোফোনটা দেওয়াল ভেদ করে বাইরে চলে গেল এবং বাইরেও সেভাবে ঘুরতে লাগল। গানটাও ঠিকমত বেজে চলছিল। তারপর আবার গ্রামোফোনটা ঘরের মধ্যে চলে এলো। গানটা কিন্তু অবিরামভাবে চলতে থাকে। সমস্ত ঘটনা ঘটতে পাঁচ মিনিটের মত সময় নিয়েছিল। সেখানে উপস্থিত সকলেই এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গ্রামোফোনটা ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় এবং বাইরে থেকে ঘরে আসবার সময় দম করে একটা জোর শব্দ হয়েছিল। কিন্তু গ্রামোফোনের গান বন্ধ হয়নি।

তিনি এই সভায় আরো বলেছিলেন যে, সমস্ত প্রেতাত্মারা জড় শরীর ধারণ করতে সক্ষম হন না। অধিকাংশ প্রেতাত্মারা মিডিয়মের সাহায্য নিয়ে পার্থিব শরীর ধারণ করেন, আর যাঁদের মানসিক ইচ্ছাশক্তি প্রবল তাঁরাই কেবল মিডিয়মের সাহায্য নিয়ে বিদেহ অবস্থায় দেহ ধারণ করতে পারেন। এখানে তিনি দর্শকগণকে বলেন, যে-সব প্রেতাত্মারা জড় শরীর ধারণ করেন তাঁরা নিজেরাই কিন্তু জানেন না তাঁরা শরীর ধারণ করেছেন। তারা বেশীক্ষণ শরীরটাকে ধারণ করে রাখতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরেই তাঁদের দেহ গলে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তিনি এও বলেছিলেন যে বেশীরভাগ লোক যাঁরা প্রেততত্ত্বানুশীলনের সংগে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, পরলোকের বিদেহী আত্মারা ইহলোকের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান, তাঁরা মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে সংযোগ আদান প্রদান করতে ইচ্ছুক। সাময়িকভাবে তাঁরা পার্থিব শরীরও ধারণ করতে পারেন এবং তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য তাঁরা চিত্তাকর্ষক অনেক কাজও সম্পাদন করে থাকেন। (ক্রমশঃ)

কবিং পুরাণম্

শ্রীশরণাপুরী

প্রাচীন সংস্কৃত যুগ থেকে আজও চলে আসছে কাব্যে ঋতু বর্ণনার প্রাচুর্য—শুধু পরিবর্তন হয়েছে তার ছন্দের, ভাষার, কিন্তু ভাবের।

কবির বিচিত্র ভাব ক্ষণে ক্ষণে বহুভাবে প্রকাশিত হলেও প্রত্যেকেরই নিজ নিজ একটা বিশেষ ভাব তারি মধ্যে সঞ্চিত থাকে। যেমন—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি কবিগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি নরনারীর মিলন-বিরহের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্য রচনায়। এঁদের কাব্যের প্রাণ যেন বিরহাত্মক—গতি অভিসার ধর্মী—

বৈষ্ণব কবিরা ছন্দে ছন্দে এগিয়ে চলেছেন অপ্রাকৃত লীলার ভাবসম্মেলনের দিকে। এখানেও সাক্ষাৎ মিলন হল না।

ঋতুরঙ্গের কবি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর মাঝি উজান বইলো তার জীবনদেবতার সন্ধানে। এখানেও অভিসারের ভার! কিন্তু আমাদের পরম কবির ভাব-ধারাও বহু ভাবে প্রকাশিত হলেও তাঁর কাব্য যেন দর্শন ধর্মী। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কল্প শিহরিত হয়··· সঞ্জীবিত হয়·· উপলাহত উর্মীর মত স্রোতস্বিনী হয়—দক্ষিণে, বামে, উত্তরে, পশ্চিমে, উর্দ্ধে, নিম্নে, লতায়, পাতায়, ফুলে ফুলে, বক্ষে বিদ্যুতে, প্রজাপতির পাখায়, পাখীর কাকলিতে, গানে, গন্ধে, মধুরাক্ষীর তরঙ্গভঙ্গে, সুরধুনীর কুলুকুলিতে, খর রৌদ্রে, মেঘের কজ্জলে, শরৎ শিশিরে, হেমন্ত হেলায়, শীতের শুভ্রতায়, ঋতুরাজ বসন্তের বুকে তার প্রিয়জনের প্রকাশ দেখে। তিনি যাঁর সঙ্গে চির অবিচ্ছিন্ন···যিনি তাঁর হৃদিস্থিত · যিনি তাঁর সঙ্গে একীভূত···চির অচঞ্চল হয়েও যিনি চির চঞ্চলা লীলা রহস্যময়ী।

একটি উপমা যেমন—সঘন বর্ষায় জয়দেবের কাব্যে, নায়িকা রাধার মন আতুর হয়েছে সাথের রাসোৎসবের,

বিরহে—

ঈশ্বর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

কিন্তু বর্ষার নীলকান্ত মেঘ দেখে আমাদের পরম কবির মনে বিরহ জাগল না, জাগল দর্শনের পুলকানন্দ··· তিনি লিখলেন—

তুমি যে জননী মোর কৃপায় পাওল
আমি যে দেখেছি তোর পাওল বরণ।

হেমন্তের অবসানে অমরগুণ্ঠিত শুভ্র শীতকে দেখে যাঁর মনে পড়ে যায় শ্যামার দুলালীকে মনে পড়ে যায় ধরণীতে যিনি জ্ঞান দিতে এসেছেন—সেই সারদা সরস্বতীকে—মনে পড়ে যায় ষোড়শী পূজা প্রপন্নতা বসনা রূপিণী সারদেশ্বরীকে, সেই পরম কবি একদিন চমকে উঠলেন, লতায় পাতায় কুন্দদলে, শীর্ণ আমোদরের জলমন্ত্রীরে, ধানের শীষে, বেণুবনের নিঃস্বনে সারদা জননীর রূপের সূক্ষ্মা প্রতিফলিত হতে দেখে—তিনি লিখলেন—

বাংলা মাটির মা যে সো তুই
বাংলা মাটির মা।
এই শ্যামল-মেঘের ছায়া দেখি
নয়নে জমা॥
সারদা তুই জানবা তুই জানীর কাছে
আমার বুকে থেকে থেকে শুধুই যে বাজে
তোর ছন্দ সুষমা॥
তোর স্নেহের পরশ অঙ্গে বুলায়
বনের ভিজে হাওয়া
দেখি লতায় পাতায় দোল দিয়ে যায়
মায়ের স্নেহের মায়া॥
তোমার স্নেহের শ্যাম সোহাগে
মাঠে মাঠে পুলক জাগে
বনে বনে ছড়িয়ে আছে
তোমারি ঐ শ্যামলিমা
বাংলা মাটির মা—

নানা বর্ণের ফুলোচ্ছাস হারা···পাপিয়ার গীত হারা··· কুসুম গন্ধবাহী পবন হারা শীতের ধরণী—উদাস উচ্ছাস হারা শীর্ণ আমোদরকে দেখে যিনি হয়েছিলেন ব্যথাতুর···যাঁর দৃষ্টি হয়েছিল নীরব বীণার তারে যাঁর কমল হাতখানি হয়েছিল নিথর—সহসা সেই পরম কবি সারদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব তিথিতে হলেন উছলিত—তিনি লিখলেন গান—

ওগো ও "শ্যাম দুলালী" মা
ও আমার "পৌষলক্ষ্মী" মা
একি গো ভরা ঝাঁপি নিয়ে এলি
ভরে আঙিনা।
আজো তো ফুল ফোটেনি
ধরার গোঠে
ঘুম ভাঙেনি সোহাগ ছুটে
রিক্ত বুকে তাই ছোওয়ালি
রক্ত কমল পা।
উদাও ধূ ধূ গগন শুধু
চায় যে পথের পানে
স্বপন হারা নয়ন তারা
জাগবে গানে গানে
তোর আগমনীর গানে
আজ ভরা মাঠে ভরা বাটে
লুটিয়ে পড়ে যা।

ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্য ছাড়িয়ে চলতে চলতে সহসা একদিন যিনি রূপ সাগরে ডুব দিলেন তারপর রূপ সাগর থেকে উত্থিত হয়ে যিনি রূপের বিলাস ছড়াতে লাগলেন গান কবিতার প্রতি ছন্দে ছন্দে সেই পরম কবি একদিন শিরীষ পাতার ফাঁক দিয়ে ভরা চাঁদের আলোকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে হলেন বিস্মিত—তাঁর মনে হল যেন আঙিনাতে শতদল বর্ণা দুটি চরণ ফুটে উঠলো—তাই তো তাঁর কলমে এল গান—

আঙিনাতে দুধ কমলের আলপনা
মায়ের আলতো পায়ে রয় বোনা॥
আকাশ গাঙে ভেলায় প্রদীপ
সঙ্গী চাঁদ চাই বোনা

চরণ ঘিরে উদয় তীরে
লক্ষ চাঁদ যে উন্মনা।
সাক্ষ্য মা তোর গৌর আঁচলে
নাই তো দুঃখের হিসেবনা।
সোনার ধানে ঘর ভরেছে
বুকের কোণায় চুম জমা।

আধো ঘুমে ডেকে ওঠা পাপিয়ার মত হঠাৎ চমকে ওঠে কবির মন, তিনি চোখ মেলে দেখেন, আকাশ বর্ণা থেকে অফুরান জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ফুলময়ী ধরণী কিন্তু এ তো শুধু জ্যোৎস্নাধারা নয়, এ যেন আরো কিছু—

ভরা চাঁদ ভরা গাঙে
রূপ যে ভেসে যায়
সারদা না কমলা গো
চেনাই হল দায়
ফুলের বনে ফুল দেখি আর
দেখি চরণ সোনা
বালাই নিয়ে আমরি গো
কমল সেঁচা পায়।
সন্ধ্যা দিল সোনার ঝাঁপি
হায়, ধোয়া ভুঁই
ছির আসন শুছিয়ে নিয়ে
মা গো বুকেই তোরে থুই।

বাঁশীর নীলে গগন নীল
খেয়া হারা সুর
হৃদয় যে আজ কানায় কানায়
উছলে যেতে চায়।

সহসা একদিন মায়ের দর্শন পেয়ে কবিমন আনন্দে উজ্জীবিত উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। কিছুটা যেন দিশাহারা হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর মাকে—

মা গো আমার কোথায় তোরে থুই
হৃদকমলে রইবি নাকি
বনের কমল ভুঁই।
প্রলয় সাগর নয় তো ওমা
রূপের সাগর সেঁচি
রূপশ্রীতে বিশ্বময়ী
নারায়ণী তুই
আকুল নিশি আকুল দিশি
আকুল সারা বন
কার চাওয়াতে কূল হারান
নদী আমার মন
মুক্ত নিটোল সোনার চাঁপা
চরণ দেখি আজ
বিশ্বরূপে অমল আলোয়
আঁধার এ বুক থুই।

ভ্রম সংশোধন

ভাবমুখে কার্তিক সংখ্যায় 'রজত-জয়ন্তী উৎসবে ভাবমুখে'র সম্পাদকের বিবৃতি নিবন্ধে তিনশত সাতষট্টি পাতার ২ পঙক্তিতে "সাহিত্যের ভোজে" স্থলে "প্রকৃতির ঐক্যতান স্রোতে" হবে। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক
ভাবমুখে।

কল্যাণেশ্বরী তীর্থ-ভ্রমণ

যোগদাপুরী

দূরে বহুদূরে নয় তবুও দূরে কয়েকটি ছোট ছোট দিবাধাম দর্শন করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরা পাখীর মত সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করলাম। মাণিকজ্যাঠা অর্চনাদি ও আরও সন্ন্যাসিনী মায়েরা ও দিদি বোনেরা, যেমন শরণাদি আরতিদি আরাধনাদি অনামা বুধি ও অর্পিতামা মন্দিরে বসে জপ করছিলেন তাঁদের প্রণাম করে ও কুশলাদি সংবাদ নিয়ে একটু মন্দিরেই বসে পড়লাম, তাঁরাও আমাদের যাত্রা পথের শুভ সংবাদ নিলেন। মন্দিরে কিছুদূরে আরতিদি ডেস্ক নিয়ে লিখছিলেন, যোগেশ তাঁমুখে পত্রিকার সেবা—তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে বল্লেন, যোগমায়া অগ্রহায়ণ মাসের লেখা দিয়ে দিস, চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি ছোট একটু হাঁ দিয়ে বললাম—এই তো এলাম, দেখছি, তবে এই মাসে হয়তো দিতে পারবো না ইত্যাদি। যাক সেদিন সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে আশ্রমবাসী সকলেরই কাছে বসে শুরু হয় আমাদের তীর্থ দর্শনের কথা। সেই পরিশ্রান্ত মনের পাতায় যে দিব্য কল্যাণেশ্বরী ভ্রমণটি ভেসে উঠলো সেইটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কল্যাণেশ্বরী মায়ের দর্শন হবার আগে সেখানকার কিছু কথা শুনলাম আমরা অন্নপূর্ণামার কাছে বসে। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা বলে উনি বল্লেন মা খুব জাগ্রত। ওটী আমার ছেলেবেলার স্মৃতি। বেশ পাহাড় ঝরণা আছে, তোদের খুব ভাল লাগবে। ঠাকুর হারিয়ে সব পড়ে আছিস, আশ্রম ও পূজার নানা কাজে সব ব্যস্ত ছিলি, একটু সব আনমন হয়ে আয়। আমাদের মধ্যে সুমনাদি মহামায়াদি প্রভৃতির মন ঠাকুরের আন্তর্ধানের পর থেকে খুবই তীর্থ পাগলের মত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে আমি গীতাদি ও সতীমাও ঐ তালেই থাকি। মনে হয় হিমালয়ে কি সমুদ্রের তীরে জপ ধ্যান করে দিনগুলো কাটিয়ে দি কিন্তু সে উপায় নাই। আমাদের তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা দেখে বাবা সানন্দে রাজী হলেন ও পূজনীয় মাণিকজ্যাঠা ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত মনোরঞ্জনবাবু, স্বামী অরুণানন্দ, অমলানন্দ, যাওয়ার সুব্যবস্থা করে দিলেন। কল্যাণেশ্বরী মায়ের দর্শন সেদিন গিয়ে হবে না, তারপরের দিন সকালে মন্দির খোলা থাকবে। কাজেই রাত্রিসঙ্গ থেকেই যাওয়া হবে পরের দিন। সেখানে আমাদের ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত সন্তান হরেনবাবু ও কল্যাণীমার বাড়ী আছে। তাঁদের সন্তান যুল মহারাজও ঠাকুরের সাধু সন্তান হয়ে আশ্রমে বাস করছেন। আমাদের যাওয়ার কথা শুনে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে জানিয়ে এলেন যাতে মায়েদের কোন অসুবিধা না হয়। আর যে কয়দিন সেতে থাকী থাকে এসের পর এক চিঠি আসে, তাঁদের একান্ত অনুরোধ আমরা যেন যাই এবং সেই সৌভাগ্য থেকে যেন তাঁরা বঞ্চিত না হন···ইত্যাদি। কল্যাণেশ্বরী মায়ের দর্শনের সুব্যবস্থা দেখে আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। ঠিক হলো লক্ষ্মীপূজার পরদিনই আমরা রওনা হব বেলা এগারটার ট্রেনে।

তার পরদিন ভোর থেকে তীর্থ যাত্রীদের যাবার তাড়া পড়ে যায়। স্নান পূজা পাঠ আশ্রমের কর্মানুষ্ঠানগুলি সেরে নিলাম। সেদিনের যাত্রা পথের শুভ আশীর্ব্বাদ জানাবার জন্য ঠাকুরের বেদছন্দা বইটি খুললাম, প্রথমেই ৪র্থ তিনটি লাইনে হাত পড়লো—"পড়ছো—ঠাকুরকে সামনে রেখে পড়বে, ঠাকুরকে শোনাচ্ছি মনে করে। ক্রিকেট খেলছো—মনে মনে তাঁকে সঙ্গী করে নেবে, বেড়াতে যাচ্ছো মনে মনে সেখানেও তাঁকে সঙ্গী করে নেবে, তাহলে সোলমালেও আর অভ্যাসের বিচ্যুতি হবে না, জোর বাড়বে।" বেদছন্দা বইটি প্রণাম করে তাঁর সেই আশীর্ব্বাদ

নিয়ে আমরা তৈরী হোলাম। ঠাকুরের মূর্তিই আমাদের সাথের সাথী, তাঁর মূর্তি বুকে নিয়ে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ, প্রণাম করে আশ্রমের সকলের সঙ্গে দেখা করে মনোরঞ্জনবাবুর ভ্যানে করে আমরা রওনা হোলাম হাওড়া ষ্টেশনে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেণ এল রিজারভেশন কামরায় অমলানন্দ মহারাজ তাঁর সঙ্গে সন্দিদের নিয়ে মালপত্রগুলি উঠিয়ে দেওয়ালেন ও যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেগুলি লক্ষ্য করলেন। আমরা তীর্থপথের যে কয়জন যাত্রী হয়েছি তাদের মধ্যে আছি গীতাপুরী সুমনাপুরী মহামায়াপুরী সীতাপুরী শোভাপুরী আর বড় পিসিমা (ঠাকুরের বোন হেনু) ও মাধুরী মা। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন গার্জেন হিসেবে ছোট সাধু ভাই মন্টু অরুনানন্দ মহারাজ নীলানন্দ মহারাজ ও রামপ্রসাদ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেণ ছাড়লো। হাওড়া ষ্টেশন থেকে কয় ঠাকুর জয় ঠাকুর বলতে বলতে অমলানন্দ মহারাজ (দাদা) চলন্ত ট্রেণ-খানির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের গাড়ী ছুটে চললো কল্যাণেশ্বরী দেবীর তীর্থপথে।

বৈশাখের মত উত্তপ্ত রোদ না হলেও হেমন্তের মধ্যাহ্নের মৃদু আলো হাওয়া ট্রেণের জানালা দিয়ে এসে বেশ করে যায়। একের পর এক ষ্টেশনগুলি পার হয়ে গেল। তারই মাঝে বৈচিত্র্যময় ছবি—কোথাও সারি সারি বড় বড় মাঠের সবুজ ধানের মিতালি, কখনও দূরে পাহাড়ের সারি, নদীর জলে ভেসে বেড়াচ্ছে ছেলে ডিঙ্গি, গাছে গাছে দু একটা করে উড়ন্ত পাখী এসে বসছে, ঘর বাড়ী, ও বড় বড় রেল লাইন অনেকগুলি দেখা গেল তারপরই বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। আমরা ট্রেনের জানলা দিয়ে সমস্ত দৃশ্যগুলি ঠাকুরকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে এলাম, বর্দ্ধমানেও ঠাকুরকে, গোপালকে ভোগ নিবেদন করা হল। যদিও আমাদের সঙ্গে গোপালজীর বিগ্রহ খানি কিন্তু তাঁর পটমূর্তিটি ঠিক জাগ্রত গোপালের মত সমস্ত জিনিষগুলি উৎসুক হয়ে দেখছিলেন। আমাদের গোপালজীর পরম বোধ হচ্ছিল, এমন সময় মন্টু লোসেন পেপার দিয়ে গেল সুমনাদি সতীমা মাধুরীমার হাতে। গীতাদি সেই ঠাণ্ডা লোসেন পেপার নিয়ে গোপালজীকে হাওয়া করতে লাগলেন। সাধু ছেলেরা অনেকে চা জল খেল। আবার ট্রেণ চলতে শুরু করলো। আমাদের কিন্তু এদিকে জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। ষ্টেশনের জল বা কেনা চা আমরা কেউ খাই না। এমন সময় শোভামা বল্লেন, আমাদের গ্লাসে ঠাণ্ডা জল ভরে দিয়েছে, এই নে, তোরা খা। সকলে মিলে তার দেওয়া ঠাণ্ডা জল খেয়ে আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হ'য়ে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ষ্টেশন পার হয়ে যায়। জানলা দিয়ে কেরী করে বেড়ায় কখনও বাদাম কখনও অরেঞ্জ লজেন্স, চা, চানাচুর লেমুয়া প্রভৃতি। আমরা বাদাম ভাজা ও লজেন্স কিনে গোপালের ভোগ দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার মাঝে উধাও দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কেটে গেল। সূর্য্য প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে আসে এমন সময় পাশের কামরা থেকে একতারার ঝঙ্কারের সঙ্গে বাউলের কণ্ঠ ভেসে এল—ভালন সঙ্গীত। এমন সময় দুর্গাপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। আমাদের মধ্যে একজন সাধু ভাই নেমে পড়লেন সেখান থেকে জয়দেব আশ্রমে যাবেন বলে। আবার মুসাফির ট্রেণ চলতে সুরু করে। কয়েকটী ছোট ছোট ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী থামলো সন্ধ্যাবেলায় রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে। আমরা সকলে নেমে পড়লাম। জয় ঠাকুর জয় ঠাকুর বলে বাড়ীর গৃহকর্তা হরেনবাবু ও তার ছোটছেলে সঞ্জীব ও শিশির এগিয়ে এল এবং সমস্ত জিনিষগুলি গুছিয়ে তুলিয়ে নিয়ে অতি আনন্দের সঙ্গে আমাদের মটরে চড়িয়ে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। সামনেই কল্যাণীমা একমুখ হেসে আনন্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। বাড়ীর পাঁচ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে প্রবীণ মানুষ পর্যন্ত আমাদের দেবতার সেবা পূজা করার মত আদর সম্মানে ভরিয়ে তুললেন। আর বড় পিসিমাকে দেখে তো সকলেই পায়ের কাছে আনন্দে লুটোপুটী বিশেষ করে কল্যাণী মায়ের। আমরা বাড়ীতে ঢুকেই অনুভব করলাম বেশ সাত্বিক ভক্তের বাড়ী। লঙ্কাৎ মহারাজদের বাড়ী থেকে উদ্ধার করে লোকি এসেছেন আমাদের প্রণাম করতে

তাছাড়া পাড়া পোড়শিলের তীর্থ। কল্যাণী মায়ের ঠাকুর ঘরটী ভারি লক্ষ্মীশ্রী। সেখানে প্রণাম করতে গিয়ে উঠে আসতে ইচ্ছে করছিলো না। তখন থেকেই ভীড় জমে যায় আমাদের আশ্রমের ঠাকুরের গোপালের কথা শুনতে। সকলেই আমাদের জন্যে ব্যস্ত। কল্যাণীমা ভীড়টা হালকা করিয়ে দিয়ে আমাদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। পথশ্রমে সেদিন সকলেই ক্লান্ত। তবুও কল্যাণীমার কাছে আমরা কল্যাণেশ্বরী দেবীর একটী কাহিনী শুনলাম। তিনি বললেন মানসিক সঙ্গে সঙ্গে শোধ করতে হয়। একজন মানসিক শোধ করতে এক বছর দু'বছর দেরী করেছিলো, পরে যখন মানসিক শোধ করতে যায় তারা সাড়িশুদ্ধ উল্টে পড়ে মারা যায়। অবশ্য পুরই আমি কথা লোকে বলে। আর একটী অলৌকিক ঘটনা। পুরোহিতের মেয়ের সঙ্গে মা খেলতেন— তবুও তোষ দিতে দেরী করেছিলো কিংবা সে তার নৈবেদ্যতে নজর দিয়েছিলো সেইজন্য তাকে মা খেয়ে ফেলেন। আবার শোনা যায় মা যে গুহার মধ্যে আছেন অনেক যাত্রী হাত ঢুকিয়ে পূজা করতে গেলে মার কাপড়ের আঁচল নাকি হাতে ঠেকে। কল্যাণীমা হেসে বলেন, তবে আমি মা পূজা প্রণামী দিয়ে এসেছি, তবে গুহার মধ্যে হাত ঢোকাই নি। আমাদের সন্তানন্দ ঠাকুর নয়। এই দেখুন মা সাধুদের অর্ঘ্য দেবার জন্যে কাপড় কিনেছি কিন্তু ঠাকুরেরটী তো ভুল হয়ে গিয়েছিলো। ঠাকুর আমার অপরাধ নেবেন না, তাই ভক্ত মাধুরীমাকে স্বপ্নে জানালেন ওঁর কাপড়টীও যেন কেনা হয় প্রথমেই তো মা ভুল করেছিলো, তিনি ঠিক করে নিলেন। কল্যাণী মা শেষে বলেন, অন্তর্যামী নারায়ণ আছেন আমাদের ভাবনা নেই। ঠাকুরের গল্প কথা শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

নূতন যায়গায় নূতন ছবি ফুটে উঠলো। ভোর থেকেই শুনতে লাগলাম কার্ত্তিক মাসে হরি সংকীর্ত্তন। আমরা জলযোগ স্নান ইত্যাদি সেরে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম কল্যাণেশ্বরী মায়ের দর্শন পূজাদি দেবার জন্যে। যাবার আগে আমরা গৃহ কল্যাণের জন্যে অনেকক্ষণ হোম নাম পাঠ করলাম। গীতাদি হোম করলেন আর আমি সুমনাদি মহামায়াদি গীতাপাঠ চণ্ডীপাঠ করলাম ও সকলে মিলে নাম করলাম। শোভামা সন্তোষা মাধুরীমা ও বড় সিসিমা খুব ভক্তিভরে সঙ্গে জপ করলেন। আমরা এখান থেকে যে প্রসাদী মালা নির্ম্মাল্য নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলি কল্যাণী মায়ের হাতে দেওয়া হল। আমরা আর একটী ঘরে ঢুকে তো অবাক। সকলেই ঠিক করে আছি একদম কিছু না খেয়ে মায়ের পূজা দিয়ে আসবো কিন্তু ঘর ভর্ত্তি অনেক রকমের খাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে স্বপ্না শিপু ও তার ছোট নাতি চুনী পর্য্যন্ত। আমরা বললাম এখন আমরা কেউ কাজু বাদাম বিস্কুট মিষ্টি ফল খাবোনা আগে মায়ের পূজা দিয়ে আসি কিন্তু হরেনবাবু থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর সকলেই এত ব্যস্ত হলেন যে, একটু কিছু মুখে না দিয়ে যাওয়া হবেনা। আমরা যতই বলছি সকালে তো চা খেয়েছি, তবু না হয় চা খেয়েনি। বিশেষ করে বার বার আপত্তি জানানোর জন্যে যাদের সিদ্ধিপড়া একেবারেই সহ্য হয়না দু'একজন একটি করে মিষ্টি খেয়ে চা খেলেন, আর কেউ একেবারেই কিছু খেলেন না। আমাদের সকলেরই তখন মনে পড়ে আছে তাড়াতাড়ি করে যেন মায়ের দর্শন ও পূজাদি সেরে আসতে পারি যদি বেলা হলে মন্দির বন্ধ হয়ে যায় আজ মঙ্গলবার ইত্যাদি। কল্যাণীমা বলেন ঠিক পূজা হয়ে যাবে, বেলাতে মন্দির খোলা থাকে।

দুটী গাড়ী ছুটে চললো তীর্থ পথের দিকে, রাণীগঞ্জ সহর পার হয়ে। একের পর এক সহর গ্রাম পেরিয়ে যায়। সকালের স্নিগ্ধ রোদের আলোয় বন বনান্তের রঙীন ছবির দৃশ্য পেরিয়ে গেল। আবার বড় বড় সহরগুলি ঢুকবার আগে সারি সারি রেল লাইন, কোথাও সুন্দর সুন্দর উদ্যান, বড় বড় বাজার দোকান, মিষ্টি ডিস্পাইনের বিরাট বিরাট হোর্ডিংস, তার আগে ও ডানপাশে কয়লার খাদ। আসানসোল সহরের ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। উঁচু নীচু সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের নীচে দিয়ে বরাকর নদী পেরিয়ে গেল। মুক্ত উদার আকাশের

আলো দেখা ডেকে নিয়ে যায় ঐ দেখে। এমন সময় রব—ঐ তো কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দির। একটী গাছের ছায়ার নীচে আমাদের গাড়ী দুটি থামলো। আশেপাশে কয়েকটি ছোট ছেলে খেলছিলো তারাও এগিয়ে দেখতে লাগলো। জায়গাটি বেশ শান্ত নির্জন, বেলপাতার গাছ মাঝে মাঝে। সৈনিক যাত্রী দলের মন্দিরে যাবার ব্যস্ততা পড়লো. পূজা দেবার জন্যে ফুলমালা মিষ্টি আনতে পাঠানো হল। মন্দির চুকতে দুয়ারে দোকানের সারি। পূজার ফুলমালা মিষ্টি সবই দেখলাম সেখান থেকে বিক্রি হচ্ছে, এমন সময় জয় ঠাকুর জয় ঠাকুর রব উঠলো—আমাদের আশ্রমের আর দুটী মহারাজ এসেছেন কল্যাণেশ্বরী দেবীর দর্শনে. এক সঙ্গে মাঙ্গলিক পূজায় যোগ দিতে সুহাসদা হিরুদা। সকলের খুব আনন্দ হোল, বড় করে পূজার ডালি নিয়ে আমরা মন্দিরের বারান্দার অপেক্ষা করতে লাগলাম. কেননা মন্দিরে তখন খুব ভীড়। সকলেই বলাম যাকে আমরা গান শোনাই, আমাদের ঠাকুরের রচিত শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে চললাম একের পর এক। যারা মন্দির থেকে পূজা দিয়ে আসছে তারা এই সৈনিক যাত্রীদের দেখে চকুষ্বির করে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে মন্দিরের ভীড় কমে গেল তখু আমরা মায়েরা গিয়ে ঢুকলাম পূজা দিতে। মন্টু ভাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট অন্ধকার মন্দির। দুরে মিট্ মিট্ করে প্রদীপ জলছে, সেই আলোয় আমরা প্রথমে দর্শন করলাম জবাফুল মালা বেলপাতা ঢাকা দেওয়া একটী গুহা, তার ভেতর কল্যাণেশ্বরী মা থাকেন। পূজার সময় পূজা নেবেন বলে মা সামনে বসেছেন। ছোট্ট সোনার কালীমূর্ত্তি —চারপাশে ফুলের রাশি। পুরোহিত আমাদের মন্ত্র বলিয়ে দিলেন আমরা সুন্দরভাবে তিনবার করে অঞ্জলি দিলাম। পুরোহিত বল্লেন আপনাদের অধিকার আছে, মাকে স্পর্শ করতে পারেন। সকলেই তাই করলাম। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সকলে আমরা সারদে শিবে ত্রিনয়নী সত্যানন্দ রামকৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে মন্দির প্রদক্ষিণ করে যা যেখানে সাঁঝা পরেছিলেন সেখানে গেলাম। কয়েকটি করে যাত্রীরা যাওয়া আসা করছে। বড় বড় গাছের ছায়ায় শান্ত নির্জন বারান্দা। মন্দিরের কোলঘেসে পাহাড়ের নীচে নীচে স্বরণা নদী বয়ে যাচ্ছে—আমরা পাথর ভাঙ্গা পথ দিয়ে সেই মন্দিরে গেলাম। মাধুরী মা বড়পিসিমা বয়স্ক মানুষ কিন্তু বেশ সাধুরে রাস্তাগুলি পেরিয়ে এলেন। আমরা পূজা, প্রণামী দিলাম। সেখানকার পুরোহিত বল্লেন, মা এই ঘাটে বসে আমা কাপড় চেঞ্জ পরেছিলেন, তাই মন্দিরের ভেতর জল বয়ে যাচ্ছে। মা কাপড় চেঞ্জ পরেছেন শুনে সুমনাদি শীতাদি আরও পাঁচ দশ টাকা করে সেখানে দিলেন মায়ের কাপড় কিনতে। এই নির্জন পাহাড়ে বসে মনে হয় অনেকক্ষণ ধ্যান করে কাটিয়ে দি কিন্তু তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আবার পাথর ভাঙ্গা রাস্তাগুলি পার হয়ে কল্যাণেশ্বরী মায়ের বড় উঠান দিয়ে দেখতে দেখতে এলাম। মঙ্গলবার - তাই পাঁঠাবলির ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম তাড়াতাড়ি করে। পাশেই একটী তপতারিণী মন্দির দর্শন করে পূজা প্রণামী দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠলাম। তখন বেলা বারটা বেজে গেছে। অনেকের জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে দেখে কেউ কেউ ঠাণ্ডা জল খেলাম। কিছুটা গাড়ী চলার পর আবার একটী গাছের ছায়ায় গাড়ী থামলো। আমাদের সঙ্গে যারা গার্জেন হিসাবে গিয়েছিলেন তাঁদের একান্ত সাথে কল্যাণেশ্বরী তীর্থের একটী ছবি তোলা সেখানের স্মৃতি স্বরূপ। তাঁদের একান্ত অনুরোধে আমরা নেমে পড়লাম। মন্টু তার ক্যামেরাটা নিয়ে ছবি তুলে নিল। আবার হুড়োহুড়ি করে গাড়ীতে উঠলাম। ছুটে চলে গাড়ী। বেশ কিছুদূর গাড়ী চলার পর শুনলাম আবার আমাদের নামতে হবে, হরেনবাবুর মেয়ে নেলীদির একান্ত প্রার্থনা তাদের বাড়ীতে সাধুরা একবার চরণধূলি দেবেন। তাই হল, তার সুন্দর কোয়াটারে নেমে গোপালজীর নানা রকমের ভোগ হল। পনেরো মিনিটের জন্য ঘুরে এসে আমরা আবার গাড়ীতে উঠলাম। দুটী গাড়ী বিশেষ স্পীড নেওয়ায় আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে রাঁচীসহরে ফিরে এলাম।

সকলেই স্নান, হাত মুখ ধুয়ে গোপালের অন্নপ্রসাদ পেতে বসলাম আমরা ও সাধুরা একসঙ্গে। ছোট মেয়ে দুটী স্বপ্না ও শিপু আজ করেছে নূতন বস্ত্র পরে। আমরাও মায়েরা সকলে বসে একসঙ্গে গীতার শ্লোকটি বলায় 'যৎ করোষি.....' তারপর অন্নপ্রসাদ খেলাম। ভোজন খেলায় কেউ বসে জপ করছে, কেউ শুয়েছে আবার মা'র ঠাকুরের দর্শনাদির কথা উঠলো। সতীমা বল্লেন, খুব আশ্চর্য! আমি আজ সকালে কল্যাণীমার ঠাকুর ঘরে পূজা করতে গেছি সেখানেই শিবপূজা করলাম লিঙ্গমূর্তি দেখে। শিপু স্বপ্না এসে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় এই শিব পেয়েছিলে? তারা শিবের কথা শুনে অবাক। বলে শিব তো নেই। ঠাকুর ঘরে গোপাল মূর্তি, আমাদের ঠাকুরের মূর্তি আর লক্ষ্মী আছেন আমি তো অবাক, তবে আমাকে দয়া করে দর্শন দিয়েছেন। এমন সময় মাধুরী মা বলেন, জানো প্রসাদও কল্যাণেশ্বরীতে খুব ভালো দর্শন করেছে আমাদের ঠাকুরের। তোরা যখন মন্দিরের বারান্দায় বসে মাকে গান শোনাচ্ছিলি ঠিক সেই সময় দেখে ঠাকুর ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার আনন্দের কান্না দেখে আমি জিজ্ঞেস করায় এই দর্শনের কথাটি বলে। শুনে বড় পিসিমা বল্লেন ছেলেমানুষ তো ওকেই ঠাকুর দর্শন দিয়ে জানালেন আমি তোদের সঙ্গে আছি। মহারাজাদি সুমনাদি সতীমা ও সকলেই বল্লো আমরাও কিছু কিছু বুঝেছি। যেন সময় অনেকগুলি ভক্ত মায়েরা এসেন, সুমনাদি শোভামা ঠাকুরের কথা বলেন সরযূ মহারাজের বাড়ী সকলের ইচ্ছা সাধুরা গিয়ে নাম কীর্ত্তন করে আসেন সেদিক থেকে আমরা একান্ত অমত করলাম। কেননা মায়েদের ঐ রকম ভাড়াটিয়া বাড়ীর মাঝখান দিয়ে যাওয়া একান্তই অসম্ভব। ঠিক হল সাধু ছেলেরা যাবে।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে কল্যাণীমা ও তার মেয়েরা স্বপ্না শিপু ঠাকুর ঘরে মাঙ্গলিক প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খ বাজালেন। আমরাও অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ঠাকুরের রচিত সঙ্গীত, প্রার্থনা ও নাম করলাম। তারপর প্রণব-মঙ্গলম্ পাঠ হল। এমন সময় একটি ভক্ত ছেলে খুব আনন্দের সঙ্গে জোড়হাতে চীৎকার করে বল্লে, মায়েরা আপনারা সবাই এসেছেন আমাদের কি সৌভাগ্য। (এটী আমাদের ঠাকুরের ভক্ত সন্তান) দয়া করে আমাদের বাড়ীতে আপনাদের চরণধূলি দিতেই হবে। শুনলাম তিনি সরযূ মহারাজের ভাই, আমরা বল্লাম বেশ কিছুক্ষণ হল আপনাদের বাড়ীতে শুধু সন্ন্যাসীরা গেছেন আপনি বোধহয় জানেন না তাড়াতাড়ি যান। এই কথা শুনে আনন্দে বলতে বলতে চলে গেলেন। ঠাকুরের দয়াতেই মা চমৎকার খেতে পাচ্ছি। মহারাজাদিকে বল্লাম, আহা ওদের কি ভক্তি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বড় পিসিমা শোভামা মাধুরীমার মুখে শুনলাম সরযূ মহারাজের বাড়ীতে খুব সুন্দর নাম কীর্ত্তন হয়েছে। অরুণ মহারাজ নাম করেছে আর নীলানন্দ মহারাজ প্রণব-মঙ্গলম্ পাঠ করেছেন। সেদিনের রাত্রিতে আরাত্রিকের পর বড় পিসিমা, শীতালি, সুমনাদি, মহারাজাদি ও আমরা খুব হাসলাম—ঠাকুরের মজা দেখ দেখি! কল্যাণেশ্বরী মা দর্শন করতে এসে আমরাই দর্শনের বস্তু হয়ে গেলাম। সতীমা বলে উঠলেন এমন জানলে কতকগুলি আশীর্ব্বাদী ফলের প্যাকেট নিয়ে আসতাম। কত লোক অসুখ বিসুখের জন্য চাইছে। আমি বল্লাম মহারাজাদি সুমনাদিকে—এসেই তো হোম হয়েছে তারই ফল যদি থাকে তো দয়া দিয়ে দিও। কল্যাণীমা বল্লেন আপনারা এসেছেন বাড়ীটিও আশ্রমের মত লাগছে। যাক সেদিন নানা কথা বলে আমরা রাত্রে আরাত্রিকের পর ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি সকলে। কেননা সেদিন আমাদের ফেরার পালা। আমরা নিজ নিজ জিনিষগুলি গুছিয়ে নিয়ে স্নান পূজা ইত্যাদি সেরে নিলাম। এমন সময় হরেনবাবু এলেন, একটি পাঞ্জী হাতে করে আর সকলের কাছে জোড়হাত করে বল্লেন, আমার একান্ত অনুরোধ আজকে আপনাদের কোন মতেই যেতে দেওয়া হবেনা, যাত্রা শুভ নয়, ত্রয়স্পর্শ।

মাধুরী মা সুমনাদি শুনে বল্লেন, তবে জরুরত্ব করে আনা হোক ঠাকুরের কি ইচ্ছা। কিন্তু তাও বড় কল বাড়ীর সকলের বাধা দেওয়ায়। কেউ বল্লেন তবে ঘরে বসে থেকে কি হবে। আমরা আজ সরা দর্শন করে আসি। হরেনবাবু ও তার ছেলেরা আনন্দের সঙ্গে রাজী হলেন—নিশ্চয় নিশ্চয় আজ তো আবার এখানে ঘুরে আসা হবে। এদিকে কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকের ভয় হল। অত দূরের রাস্তা, মাণিকলাঠাকে তো আনিয়ে আসিনি, থাকগে কাছে কোথাও ঘুরে আসি। ঠিক হল রাণীগঞ্জের কাছেই দামোদর নদী। আর অনেকদিন থেকে আমাদের বড়দা (বিভূদা) বার বার বলে যান ঐ রাস্তা দিয়ে তো যেয়িয়ে যাস একবার আমার কোয়াটারে নামবি। সীতারামপুর এখানে খুবই কাছে, তাই হোল, এই দুটী যায়গায় যাওয়া ঠিক হল। ঠাকুরের মূর্তি বুকে নিয়ে জলের মালা হাতে করে আমরা প্রথমে বেরিয়ে পড়লাম দামোদর নদীর দিকে।

সহরের পথ দিয়ে দুটী গাড়ী ছুটে চললো। হরেনবাবুর ছেলেরা মূল মহারাজ সহীর গাড়ী চালাচ্ছে আর চারপাশে কোথায় কি, বলে যাচ্ছে। দামোদর নদী তীরে ঢুকবার আগে শন শন করে হাওয়া বইতে সুরু করলো। তারপর দেখা গেল ঘনবৃক্ষ ছায়াতলীতে গাড়ী ঢুকছে। আমরা দেখতে পেলাম সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। কোথাও বড় বড় কাঠ বাদাম বৃক্ষ সেইখানেই রাস্তার পাশটীতে আমাদের গাড়ী থামলো, আমরা সকলেই নদীর তীরে ছুটলাম কিন্তু নদীতে নামবার বিশেষ উপায় নেই। বেশ গভীর জল রয়েছে, নৌকা যাওয়া আসা করছে। অনেক যাত্রী নদীর বালির উপর হেঁটে পার হচ্ছে। অনেক ছেলেমেয়েরা গামছা করে জল ভরে মাছ তুলছে। কোথাও নদীর বহুদূরের দিকে দু একটী পালতোলা নৌকা ভেসে চলছে, কোথাও ধূ ধূ বালির চর দেখা যাচ্ছে, সেই শন শন নীরব হাওয়ার মাঝে আমাদের মনও ভেসে যায় ঐ উধাও পানে। বেশ কিছুক্ষণ স্নানে কেটে গেল। দামোদরের বিরাট বালির চর রেখে আমাদের একটী স্নানের বস্ত্র ভেসে উঠলো। আমাদের সোনার ঠাকুরকে ঘিরে সৌরলক্ষ্মীর সারদা মায়ের জন্মদিনের গান গেয়েছি, "আমোদরের সবুজ চর লক্ষ্মী রাণীর খেলা ঘর সোনার নূপুর বুঝি বাজলো," এখন মনে হয় জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেছে, শুধু পারের তরীর পথ চেয়ে দিন গোনা। এমন সময় কে একজন বলে উঠলেন—নদীর ঐ দিকে বাঁকুড়া জেলা অরম্ভ হাটীর পথ। আমাদের তীর্থযাত্রী সঙ্গীদের মধ্যে সেবারে অর্চনাদি যাননি বলে অনেকেই তাঁর কথা বললেন, তিনি এইসব প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব ভালবাসেন। এমন সময় গাড়ীতে উঠবার সময় একটী মজা হল বড় বড় গাছগুলিতে থোকা থোকা কাঠ বাদাম ধরে রয়েছে। প্রথম মন্টু সুরু করলো নানা রকম ইট কাঠ দিয়ে বাদামগুলি পাড়তে, বহু উঁচুতে ইট যায় কিন্তু কাঠ বাদামগুলি কিছুতেই পাড়া যায় না। এই চেষ্টাটীতে অনেকের উৎসাহ জাগলো, তারই সমবয়সী ও তার চেয়েও ছোট রামপ্রসাদ, সঞ্জীব প্রভৃতির। আমরা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে বল্লাম, পালোয়ান নিজের আর বাদাম পেড়ে কাজ নেই। মন্টুর কিন্তু নেশা লেগে গেছে একের পর এক ঢিল ছুঁড়তেই থাকে। সবশেষের ঢিলটাতে বেশ কয়েকটী বাদাম পড়ে গেলো। সকলের খুব আনন্দ কিন্তু তখনও একটি বাদাম ঝুলছে দেখে তাদের মধ্যে একজন প্রকাণ্ড একটি ইট নিয়ে ও'টাতে ছুড়তে গিয়ে খুব নীচুতেই উঠে বসাস করে পড়ে গেল। তার এই রঙ্গ দেখে সকলেই হেসে ফেললেন, তারপর মন্টু সেটীকে পাড়লো ও গোপালজীকে দেখালো। এইসব বুদ্ধিযুক্ত খেলা আমাদের ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। তাঁর কথা বলতে বলতে আমরা গাড়ীতে উঠলাম।

※

মা

স্বামী অরূপানন্দ

মায়া ছাড়া মহামায়ার
কিসের পরিচয়
সৃষ্টি জোড়া মায়ার খেলা
স্নেহের হল জয়।

মা-ই যদি রাখেন ধরে
মায়া কোথায় থাকে?
মহামায়াই সবের ভিতর
চরণ চিন্ আঁকে।

সৃষ্টিতে তাঁর মায়ার খেলা
স্থিতিতেও তাই
প্রলয় কালেও মহামায়া
বলেন আমার মা-ই।

বিরহ মিলনে এই
সৃষ্টি লীলা চলে
লীলার মাঝেই লীলাময়ের
রূপ যে চলচলে।

অণু হতে পরমাণু
অনন্ত আকাশ
সবই যে মায়ের রূপ
শক্তিরই প্রকাশ—

মায়ের মায়ার এই যে লীলা
চলছে নিরন্তর
বুঝলে পরে এই কথাটি
থাকবে নাকো ডর।

মায়া নিয়েই আসেন মা যে
লীলাতে হন হারা
যখন তখন আলোর রশ্মি
আনন্দে ঘট ভরা।

মায়ের মায়ায় আসেন নেমে
যুগের ভগবান।
সত্যানন্দ কণ্ঠে তুমি
প্রাণ জুড়ান গান।

"মায়ের কাছে ছেলে ছেলে
মা না হলে এমন কথা
বলো কে বলে
বুকের মাঝে নেয় কে টেনে"
প্রেমিক বাউল তাই তো গায়
নাড়ীর মর্ম জেনে।

মায়া যখন মায়ের রূপে
আসে ছেলের কাছে
ছেলে তখন ভাববে কি মা
যখন যা পাছে।

কাঁদিয়ে পড়ে বুকের মাঝে
আত্মহারা হয়ে
মিষ্টি চুমায় মা যে তখন
দেয় যে ভরিয়ে।

মায়ার যখন রূপ নিল যে
লীলার যখন হয়ে
পরম বাউল এল চুলে
সবার বুকের হয়ে।

আদ্যাশক্তি সারদা

শ্রীমঙ্গলোপাল মুখোপাধ্যায়

যঃ শ্রীস্বরীশ্বরী যঃ হ্রীস্তং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জাপুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্তং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আদ্যাশক্তি মহামায়ার এই নয়টি রূপের বর্ণনা আছে। তিনি "শ্রী" অর্থাৎ সৌন্দর্যময়ী, "ঈশ্বরী" অর্থাৎ ঐশ্বর্যশালিনী, "হ্রী" অর্থাৎ দম্ভরহিতা, "বুদ্ধি" অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা, "লজ্জা" অর্থাৎ ধর্মভয়ভীতা, "পুষ্টি" অর্থাৎ অশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্না, "তুষ্টি" অর্থাৎ আনন্দরসসমৃদ্ধা, "শান্তি" অর্থাৎ নিত্যপূর্ণা, নিত্যবিকশিতা, নিত্যতৃপ্তা, নিত্যবুদ্ধা, নিত্যশুদ্ধা ও নিত্যমুক্তা এবং "ক্ষান্তি" অর্থাৎ পরমাক্ষমাশীলা, অশেষ করুণাময়ী। তান্ত্রিক সাধকবৃন্দের সাধনায় মহাশক্তি জগন্মাতা স্থূল সূক্ষ্ম, ব্যক্ত-অব্যক্ত, সাকার-নিরাকার সমস্ত রূপেই প্রকাশিতা।

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারী কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ (মহানির্বাণতন্ত্র)

আবার শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় যিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনের নিকট তাঁহার অনন্তরূপ ও অনন্তবিভূতি ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—তাঁহার অনন্তশক্তি ও ঐশ্বর্যলীলা তাঁহার অনন্ত, অসীম সত্তার মাত্র সামান্য অংশে অবস্থিত, বৈষ্ণবসাধকগণের চিন্তায় সেই তিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) এবং দুর্গা এক ও অভিন্ন।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত গীতা)
যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এবসঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে ॥ (ব্রহ্মসংহিতা—শ্রীমৎ জীব গোস্বামী)

যুগে যুগে আদ্যাশক্তি মহামায়া এইভাবে বিচিত্ররূপে বিভিন্ন সাধকের দিব্যদৃষ্টিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। দশমহাবিদ্যার দশটি মূর্তিতেও তিনি প্রত্যক্ষীভূতা—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদৃশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

এই বিভিন্ন রূপের সমন্বয়ে পরমাজননীর একটি রূপই প্রকাশিত—তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী, বিশ্বশক্তির আধারভূতা, সর্বকারণের কারণ—কারণাতীতা। 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া-সর্বমিদম্ ততম্।' তিনি নিত্যা, তিনিই জগৎ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এবং তদাতিরিক্তা হইয়া তিনি বিরাজিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত আছে ভগবতীর বহু শক্তির বিকাশ দেখিয়া শুম্ভাসুর বলিতেছে—হে বলদর্পিতা দুর্গা, তুমি অপর শক্তির সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ, ইহাতে তোমার কৃতিত্ব কোথায়? তুমি আর গর্ব করিও না। ইহার উত্তরে দেবী বলিয়াছেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

এই জগতে আমিই একমাত্র বিরাজিতা। আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কে আছে?

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে মহর্ষি অম্ভৃণের ব্রহ্মবিদুষীকন্যা বাক্ মহাদেবী বিশ্বনায়িকার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি। অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি রূপেই উদ্ভাসিতা।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব—যাঁহার মধ্যে সাধনার জগতে তাঁহার পূর্ব্ব সূরীদের সার্থক পরিণতি—তিনি এই মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন, "যিনি জগৎ-রূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে—তিনিই 'মা'। জননী—যিনি জন্মস্থান। যিনি পরব্রহ্ম—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তিনিই 'মা'।

ব্রহ্মই শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; অভেদ। যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, আমি তাঁকে মা বলি। মা নাম বড়ই মধুর। মা আমায় দেখিয়ে দিলেন—মা ই সব হয়ে রয়েছেন।

শক্তির উপাসনা করলেই ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। যিনি সাকার সগুণ, তিনি নিরাকার নির্গুণ। যখন সৃজন, পালন, প্রলয় করেন: তখন শক্তি বলি।

আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি, ভাবছি, সবই সেই আদ্যাশক্তি, চিৎশক্তির ঐশ্বর্য। জীব, জগৎ, লীলা, সৃষ্টি, পালন, সংহার, আবার জ্ঞান, ধ্যাতা, অবতার সবই চিৎশক্তির ঐশ্বর্য। .....যা কিছু দেখছ, সবই পুরুষ প্রকৃতির (সত্তা ও শক্তি) যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করেন।

শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। .....মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই, তাই শক্তি উপাসনা। দেখনা, কাছেই ভগবান আছেন, তবু তাঁকে জানবার জো নেই। মাঝে মহামায়া আছেন বলে।"

তন্ত্র সাধনার মাধ্যমেই এই শক্তি পূজার প্রথম উন্মেষ। অনেকে হয়তো মনে করিয়া থাকেন—তন্ত্রে উপাসিতা দেবী বৈদিক দেবতা নহেন। ইহা অবশ্য সত্য যে বৈদিক সাধনধারায় যে সকল দেবতা স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পুরুষ দেবতা। ইন্দ্র, সূর্য, মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, অগ্নি ইহাঁদের অন্যতম। সে কারণে হয়তো তাঁহাদের ধারণা—মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সমাজেই দেবী-পূজার সূচনা। কিন্তু পুরুষ-প্রধান বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন স্থানে মাতৃকাশক্তি 'আদিশক্তিরূপেবতা' রূপে অলৌকিক মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে। উপনিষদ্ সমূহে বর্ণিত বিবিধবিদ্যার বিবরণ হইতে প্রতীত হয় যে, বৈদিক যুগে বৈদিক সাধন পদ্ধতির সঙ্গে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠাচার্য বলিয়াছেন—বেদ ও তন্ত্র উভয়ই শিব কর্তৃক রচিত হওয়ায় তুল্যরূপেই প্রামাণ্য। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে বৈদিক ধারায় সাধনা করার অধিকার কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যদেরই আছে। কিন্তু তন্ত্র সাধনার দ্বার সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্তিত আকার মাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে আমি ব্রাহ্মণভাগ বিশেষতঃ অথর্ব্ব ব্রাহ্মণভাগের সহিত মিলাইয়া অনুসন্ধান করিতে পরামর্শই দিই। তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অথর্বেদ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে শ্রৌত বা স্মার্তকর্ম ব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমুদয় প্রচলিত কর্মকাণ্ডই তন্ত্র হইতে গৃহীত। আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনা প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।"

এই তান্ত্রিক পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"আমার মনে হয়, বৌদ্ধ ধর্মের যখন পতন আর হল আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত, দু'মাস ধরে আর মাস

করবার জো টি নেই, এক রাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পুজো শেষ করে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে, সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ একরাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হল।" অবশ্য পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের ভিতরেও অনেকে গোপনে তন্ত্র সাধনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজন্যবর্গ রাজত্ব করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রকাশ্যে তন্ত্র সাধনার সূচনা। তুর্কী আক্রমণের পর বাঙালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন যখন বিপর্যয়ের ঘোর অমানিশায় মসীলিপ্ত তখনই সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল শক্তি সাধনার প্রেরণা ও শক্তি অর্জনের সনিষ্ঠ ইচ্ছা। অনেকে বলেন—বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ তখন জনজীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের উদ্দেশ্যে অনার্য জাতির আরাধ্যাদেবী চণ্ডী, মনসা, কালিকা ইত্যাদির সহিত ব্রাহ্মণ-বর্ণিত দেবী চণ্ডীর সমিল স্থাপনা করিয়া শক্তি সাধনার সূত্রপাত করেন।

যাহা হউক, বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে অনেক বাঙ্গালী সাধক কবি মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে তন্ত্রোক্ত দেবীর মাহাত্ম্য ও তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্য প্রচারে ব্রতী হন্। ইঁহাদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা মুকুন্দরাম ও মনসামঙ্গলের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের কবিগণের লেখনীতে শিবসঙ্গিনী সতী কখনও চণ্ডীমূর্তি, কখনও কালিকা মূর্তি, কখনও অন্নদা মূর্তি আবার কখনও বা দুর্গা মূর্তিতে প্রকাশিতা। আদ্যাশক্তি মহামায়া অপূর্ব মাতৃমূর্তিতে চিত্রিত হইয়াছেন মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। মা মেনকার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া তিনি মাতৃমূর্তিতে ভক্তবৃন্দকে সর্ববিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। চণ্ডীতে বর্ণিতা দেবী "উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা" "চণ্ডমুণ্ড বধে দেবী রক্তবীজ বিনাশিনী।" চণ্ডীমঙ্গলে তাঁহার উগ্রতার কিঞ্চিৎ প্রকাশ থাকিলেও সেখানে মাতৃমূর্তিতে তিনি আরও বেশী মহিমান্বিতা। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে তিনি জাগতিক সুখে হ্লাদিনী, দুঃখে বিচলিতা অন্নদাত্রী জননী রূপেই প্রকাশিতা। বাঙালী মা পাগল জাতি। "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্। চোখে আসে জল ভরে" (রবীন্দ্রনাথ)। তাই মাতৃভাবরসে পুষ্ট শাক্তপদকর্তাগণ তাঁহাদের কল্পিত মাতৃমূর্তির উদ্দেশ্যে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত ক্রন্দনের সঙ্গে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী সনে ধূলা খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি সে সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই-মাটি মেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
মুছে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের ময়লা।

মায়ের সব কামনার উদ্দেশ্যে সন্তানের সেই চিরন্তন কান্নার সুরই এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

※

আমার কাছে চাইবে না? আমি মা।

—শ্রীমা

মা

ব্র. মি

হেরিয়াছি তোমা আমি জননীর রূপে
দেবী তুমি নহ মোর কাছে—
তাই তার বহুদূরে, প্রয়োজন নিত্য পূজারতি।
পার্থিব বেদন মোর স্বজনার গান—
নিঃস্ব ব'সি নিরজনে মনের দেউলে
নিবেদি সভয়ে তাই চরণে তোমার।
দীপ, ধূপ আর যত পূজার সম্ভার,
রচামালা প্রস্ফুটিত বন-কুসুমের
কিছু নাহি মোর। শুধু মোর
প্রাণের আহুতি - অশ্রুর চন্দনে মাখা।
নয়নের মোতি দিয়া রচা মাল্যখানি,
ধূপ মোর প্রাণের সুরভি।

দেবী তুমি নহ মোর কাছে—
মৃত্তিকা মানবী তুমি আমার সকাশে
ধরণীর দুঃখ দিয়ে গড়া। তাইতো প্রতিটি ব্যথা
আমার স্পন্দন সমব্যথী বক্ষে তব,
সুখ দুঃখ ঊর্মিতালে নাচে তব হৃদয়ের বেলা।

হেরিয়াছি তব রূপ সাঝাদের প্রদোষ ছায়ায়
ভিক্ষালব্ধ রত্ন ল'য়ে ফেরে যবে ধীরে
পথক্লান্তা আতুর রমণী বক্ষপর
পুত্রে লয়ে সাথে। বৃক্ষতলে পাতি' শেষে
স্নেহাঞ্চলখানি মুখে তার তুলি' দেয়
শেষ কণাটুকু অনাহারে রহি' সারাদিন।
শীর্ণ শিশু হাসে খল্‌খল্
মাতা তারে বক্ষে চাপি' ধরে।
তারি মাঝে হেরিয়াছি তোমার মূরতি।

শীতের কুহেলিঝর গভীর রজনী -
মাতা বসি' রুগ্ন শিশু পাশে
জাগরণ-ক্লিষ্ট আঁখি বাধা নাহি মানে
তন্দ্রাঘোরে লুটাইয়া পড়ে।
সহসা সুতীব্র কণ্ঠে আর্ত্ত কলরোল
বর্দ্ধিত করিয়া দেয় নৈশ হাহাকার।
ভীরু মাতা সহসা জাগিয়া
বক্ষেতে জড়ায়ে ধরে শিশু পুত্রে তার—
প্রণতি জানায় ঊর্দ্ধে দেবতার কাছে
সন্তানের মঙ্গলের তরে। শঙ্কিত
সে দুই মায়ে হেরিয়াছি তোমার নয়ন।

মাতা তুমি। হৃদয়ের ভাও তব উজার করিয়া
সিঞ্চিত করিয়া দাও সন্তানে তোমার
দিয়ে তব সুধাক্ষরা স্নেহ।
নাহি তার চাহ প্রতিদান,
আঘাতের বিনিময়ে সুধা ঝরে তব।
তাইতো বাসনা করি আলেখ্য তোমার
আঁখির সম্মুখে মোর—জানাই তোমারে
যত জগতের ব্যথা।
দিবসের যত দুঃখ ক্লেশ
নিবারিতে চেষ্টা করি নয়নের নীরে
সিক্ত করি' নৈশ উপাধান।
তুমি আসি স্বপনের ঘোরে
পার্শ্বে বসি' মোর
চুম্বিয়া ললাট আর বদন আমার
ধীরে কহ মোরে—
'ওরে আসিয়াছে দিন,
শোধিতে হইবে তোরে এবে ঋণ।'

মা সারদা

প্রবুদ্ধ

পৌষ লক্ষ্মী মা সারদা। এই পৌষে তিনি এসেছিলেন। দেশবিদেশের মন্দিরে মন্দিরে তিনি আজ জগৎজননীরূপে পূজা গ্রহণ ক'রছেন। বিশ্বজননীকে আমরা বাংলার ছেলেমেয়েরা পেয়েছি আমাদের মাটির ঘরের মা ব'লে। ..... সেই মায়ের কথা আমি যাঁদের কাছে শুনেছি তাই নিয়ে আজ মাকে অনুধ্যান করব।

প্রায় বিশ বছর আগে। একবার আমি আর আমার গুরুভাই বিমল (স্বামী বিমলানন্দ) গিয়েছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনের সারগাছি আশ্রম দেখতে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সহরের কাছে সারগাছি গ্রাম। সেখান থেকেই একদিন প্রথম সুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম। .....আশ্রমে গিয়ে মন্দিরে প্রণাম ক'রে ফিরছি, এমন সময় দর্শন পেলুম সেখানকার অধ্যক্ষ—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজের। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য তিনি। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর শিশুর মতো সহজভাবে আর আমাদের সঙ্গে আপনজনের মতো কথাবার্ত্তায় মনটা ভ'রে উঠল। ...কথা প্রসঙ্গে তাঁকে আমি বললুম—মহারাজ, আপনি তো মায়ের সন্তান; মায়ের কথা কিছু বলুন। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে মহারাজ তখন বল্লেন—মায়ের কথা কী আর বলবো! তিনি 'আমার মা' বলতে কিছু রেখেছেন? শরৎ আর আমজাদকে তিনি যে এক ক'রে দিয়েছেন! শ্রীশ্রীমায়ের এই বৃদ্ধ সন্তানের মুখে একথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। .....ছোট ছেলের মতো হ'য়ে গেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মনটা তৃপ্তিতে ভ'রে উঠল। আশ্রমের গেটের কাছে যখন এলুম তখন আমার ভাই বিমল তাঁকে বলল—"মহারাজ! দেশের কথা কিছু বলুন।" তিনি বল্লেন—"কী আর বলবো! দেশের যা' অবস্থা, তা'তে তো কোন আশাই দেখ্‌ছিনা। তবে, নিরাশার অন্ধকারে আশার আলো—এই দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, স্বামীজী এসেছিলেন, মা এসেছিলেন। এই একমাত্র আশা।"

মহারাজকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলুম আমরা।

• • • • •

খুব বেশী দিনের কথা নয়। গর্ভধারিণী মায়ের কাছে শুনেছি। ধর্ম্মপথে দর্শন ইত্যাদির কথা তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি আস্তে আস্তে বললেন—"সিউড়ী আশ্রমের মন্দিরে কোণের দিকে সারদা মায়ের যে মূর্ত্তিটি আগে ছিল, সেটি এখন বরাহনগরের আশ্রমে নিয়ে গেছে। ঐটিই তো দুর্গাপুজোর সময় দশভুজা ক'রে এখন পুজো হয়। মূর্ত্তিটি ভারী সুন্দর। জাগ্রত বলে মনে হয়। আমি তাঁকে 'কোণের মা' বলতাম, মন্দিরের কোণে বসে থাকতেন, তাই। ...একদিন

হ'ল কি—শেষ রাতে আমার শ্বশুর মশাই একটি সুন্দরী মেয়ে, লাল টুক্‌টুকে পাড় সাড়ী প'রে, সিঁথিতে টক্‌টকে সিন্দুর প'রে—আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। তার ডান হাতটি বাড়িয়ে আমার কাছে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল সে আমাকে অভয় দিচ্ছে, আর তার দু'টী চোখ থেকে দয়া যেন ঝ'রে পড়ছে। আস্তে আস্তে বলল সে আমাকে—মাকে মাঝে নিজ্জনে যাবি। আমি তখন বললুম তাকে—তুমি কে মা! —তার আলো করা মুখখানিতে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল, আর বলল আমাকে—আমি সেই 'কোণের মা'।"

॥ জয় মাঁ ত্রিনয়নী ॥
রামাবতার ছেতান

অর্চনা কিস বিধি করুঁ তিহারী
মাঁ ভবতারিণী
সংকট হরণী, মংগল করণী, কৃপা করো
মাঁ মৃদু ভাষিণী
কলিমল হারিণী, মাঁ ত্রিনেত্রী, পাবন কর দো
জয় মাঁ পতিত পাবনী
জয় ত্রিনয়নী, জয় ত্রিনয়নী
জয় মাঁ ত্রিনয়নী
স্বর-সুর স্বামিনী, পুস্তকধারিণী সুর দো
মাঁ বীণা ধারিণী
কমল-সেবনী, বিষ্ণু ভামিনী বর দো
মাঁ হংসবাহিনী
জয় পরমেশ্বরী, জগৎ ব্যাপিনী অভয় করো
মাঁ বুদ্ধি প্রকাশিনী
জয় ত্রিনয়নী, জয় ত্রিনয়নী
জয় মাঁ ত্রিনয়নী।

মণিমন্দিরের মা

স্বামী ধীরানন্দ

মণি-মন্দির ! ঠাকুরের ধ্যানের মন্দির !

সত্যানন্বেষীর দীর্ঘ পঁচিশ বছর সযত্নলালিত কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ এই মণি-মন্দির। মন্দির আলো করে বসে রয়েছেন বিগ্রহ ত্রয়—ত্রিনয়নী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা। যখন সন্ধ্যা নেমে আসে, মন্দিরের সব ক'টি আলো জ্বলে ওঠে তখন দূর ও নিকটের অগণিত দর্শনার্থীর ভিড় জমে মন্দির প্রাঙ্গণে। কেউ নিবেদন করে মৌন প্রার্থনা, কেউ বা ভূলুণ্ঠিত প্রণাম। কেউ দাঁড়িয়ে থাকে নীরব দর্শক হয়ে, কেউ করে ইতস্ততঃ বিচরণ—কেউ বা করজোড়ে ভাবমগ্ন হয়ে করে অশ্রু বিসর্জন—কেউ বা বিগ্রহের বেশভূষার করে প্রশংসা অথবা সমালোচনা—সেই অবসরে শোনা যায় কিছু বিরূপ মন্তব্য : একি মশাই। শ্রীমার এমন মূর্তি তো কোথাও দেখা যায় না। শ্রীমার অঙ্গে এত অলঙ্কার কেন? এত দামী শাড়ী কি শ্রীমা পরতেন? সামান্য লালপাড় শাড়ী আর দুটো মামুলী ধরণের হাতের বালা এই তো ছিল তাঁর রূপসজ্জা। এইতো ছিল মা'র সর্বজন পরিচিত রূপ। আপনারা তা না ক'রে অন্য রকম করলেন কেন? ..... যাঁরা এ ধরণের মন্তব্য করেন লীলাময়ীর স্থূল লীলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি যে কত ক্ষুদ্র সেকথা ভেবে অবাক না হয়ে পারি না। কি করে তাঁরা ভুলে যান—ঐ একটি মার রূপে ও ভাবেই তাঁর নরলীলা সীমিত ছিল না—মর্তে তাঁর মানবী রূপের লীলায় ছিল না কি শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্দ্ধক্যের রূপবিলাস! এতো সেল স্থূল রাজ্যের কথা। সূক্ষ্মরাজ্যে যে তাঁর রূপের নেই অন্ত। তিনি অরূপা আবার অনন্তরূপা—বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী। স্থূলরূপের লীলার মাঝেও কি জগন্মাতা দেন নি সে পরিচয়—বগলা, দুর্গা, কালী সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি তাঁর কত কত রূপের দর্শন পেয়েছে কত শত ভক্তজন। সুদূর পাশ্চাত্যে মা মেরীর মূর্তিতেও হয়েছেন আবির্ভূত—সে ইতিহাসও তো রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। তবে কেন আমি শুধু ঐ একটা রূপেরই করব পূজা।

এখন দেখা যাক্ আমাদের ঠাকুর কেন শ্রীমার প্রচলিত মূর্তি না গড়ে এমন অপূর্ব ভাবসমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক মূর্তি গড়লেন?

প্রথমতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে জগজ্জননীরূপে ষোড়শী পূজা করেছিলেন—মায়ের বয়স তখন অষ্টাদশ মাত্র—"জপের মালা, পূজার বস্ত্র, আভরণ আর তার সঙ্গে বিল্বপত্রে অঞ্জিত নিজ নাম", সব-কিছু দেবীর চরণে সমর্পণ করে আত্মনিবেদনে সমাপ্ত হয়েছিল এই মহাপূজা। "যুগ-লীলার সাথে মহামাতৃভাব" যে মূর্তিতে পেল প্রতিষ্ঠা—"মাতৃজাতির চিরকল্যাণের দ্বার সত্য করে" সেদিন যে মূর্তি-পূজার মধ্য দিয়ে হয়েছিল অপাবৃত আমাদের ঠাকুর সেই রহস্যময় মূর্তিকেই মণিমন্দিরে আদর্শ পূজার বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করে যুগাবতারের যুগ-ভাবকেই করলেন সঞ্জীবিত।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং শ্রীমা সম্বন্ধে বলেছেন—"ও সারদা সরস্বতী—সাজতে ভালবাসে।" জগজ্জননী সাজতে যে ভালবাসতেন তাঁর শৈশবকাল থেকেই পাওয়া যায় তার প্রমাণ। হরগৌরীর মিলন বাসরের পর ভিখারী জোলার সব হারানো দুঃখের সংসারে শিবজননী উমামহেশ্বরীকে যেদিন প্রথম বরণ করে আনলেন সেদিন সে

সোনার প্রতিমাকে সাজাতে হয়েছিল চোখের জলে পড়শীর কাছ থেকে চেয়ে আনা অলঙ্কারে। জননী চন্দ্রামণি ভাবিত হয়েছিলেন কেমন করে তিনি ঐ সোনার অঙ্গ শূন্য করে ফিরিয়ে দেবেন অলঙ্কারগুলি। দেব-সন্তান মার অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করে নিজেই করেছিলেন তার উপায়। রাতের কোলে যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন শ্যামার দুলালী ঠাকুর তখন ধীরে ধীরে খুলে নেন সব অলঙ্কারগুলি। নিদ্রাভঙ্গে সারদামণি যখন খুঁজতে থাকেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া অলঙ্কারগুলি, দেবজননী তখন তাঁকে শান্ত করেন—"মা, গদাই পরে তোমায় এর চেয়ে অনেক ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে"—এই প্রবোধ-বাক্যে।

আবার দেখি দক্ষিণাপুরীর লীলার শতদলটি যখন একটি একটি করে পাপড়ি মেলে ফুটে উঠছে আলোর কমলে তখন বহু মল্লিকের বালবিধবা কন্যা নলিনী এসেছে ফুলন-যাত্রাকে জননীকে নিয়ে যেতে মণি মল্লিকের ফুলভবনে। তার রিক্ত জীবনের শুষ্ক-কান্না রূপ নিয়েছিল অমৃত ধারায় শ্রীঠাকুরের একটি উপদেশামৃত গান করে—"শ্রীগুরু জগতের স্বামী—চির অবিনাশী—তাঁর চরণে সমর্পণ কর মা তোমার সবকিছু, তিনিই তোমার সর্বস্ব, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক, তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে" সাধনলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে সে চিনেছিল মা আর ঠাকুরের গোপন স্বরূপটী—তাই সে ফুলনতিথির দ্বিপ্রহরে সবার অলক্ষ্যে সারদা মাকে নহবৎ থেকে তার সাধের নিভৃতে এনে রুদ্ধ দুয়ারে নানা ফুল, মালা, চন্দন তিলকে ও লীলাম্বরীতে "বৃন্দাবনী নন্দিনী রাধার" রূপসাজে সজ্জিত করে, নিজে পীতবাসে, চন্দনে ফুলে ব্রজের কিশোর সেজে ছোট্ট ছোট্ট কুমারীদের কৃষ্ণ-রাধার সখী সাজিয়ে ভাবে নৃত্য গীতে ফুলন দোলায় দোদুল দুলিয়ে নববৃন্দাবনে মধু-ফুলন-লীলা রচনা করে ফিরে পেতে প্রয়াস পেয়েছিল সেই মধুবৃন্দাবনকে। ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন নলিনী বিভোর হয়ে যেতেন জননী সারদা—কোথা দিয়ে কেটে যেত সারাটি বেলা, সে-কথা কারো খেয়াল থাকতো না। অবশেষে দিনান্তে জননী ফিরে আসতেন দক্ষিণাপুরে।

মা যে সাজতে ভালবাসতেন এমনিতরো মধুর লীলাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। তাই আমাদের ঠাকুরও মাকে সাজিয়েছেন আমরাও আমাদের মাকে প্রাণ ভরে নিত্য নব নব বেশে সাজাই।

তৃতীয় প্রশ্ন হ'লো আমাদের দেবী মূর্তি কেন বাস্তবধর্মী হয়নি?

অষ্ট্রিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার দুটী ছবি আঁকেন। ছবি দুটী realistic এবং idealistic শিল্পের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। স্বামী অভেদানন্দের মতে শ্রীমার ছবিটি শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির "চেয়েও ভাল ও শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদান। এতে কলার কৃত্রিমতার তুলনা নেই। কমনীয়তা ও সরলতার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীমার ছবিতে যেন পরিস্ফুট। অফুরন্ত ভালবাসা ও মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ। শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না। নারীত্বের সকল কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য যেন মূর্ত ও জলন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বদা প্রসন্নময়ী ক্ষমার ভাব মুখে ও চোখে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।" তাই দেবীমূর্তি কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে স্বামীপাদের অভিমত হ'ল—"সমস্ত দেবীমূর্তিই নবযৌবনসম্পন্না হওয়া উচিত। প্রাচীন ছবি এবং ভাস্কর্যে দেখবে দেবীমূর্তিতে সর্বদাই নবযৌবন-রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বুড়ো, অসুখে জর্জরিত, রোগ বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত—এই ধরণের ছবি আঁকা বা প্রতিকৃতি তৈরী করা মোটেই উচিত নয়। শ্রীমা সম্বন্ধেও তাই। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীমার ছবিতে দেবীভাব সুপরিস্ফুট। অপূর্ব লাবণ্য ও পবিত্র স্নিগ্ধতা যেন সমগ্র ছবিখানিতে মাখানো আছে। ছবিটির সত্যই তুলনা নাই।" শ্রীমার এই মূর্তিই স্বামীপাদ বেদান্ত মঠে নিত্য-পূজার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীমূর্তি গড়া সম্বন্ধে আমাদের ঠাকুরও দেখি স্বামীপাদের সঙ্গে ছিলেন একমত—দেবীমূর্তির শিল্প শুধু realistic—বাস্তবঘন হলেই চলবে না, তাকে idealistic—ভাবঘন হতে হবে।

কারণ "দেবীমূর্তি সুন্দর ক'রে গড়তে হয়—সমস্ত শাস্ত্র এ-কথা বলেন—তাই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যতম মূর্তিই পূজিত হয় সর্বদেশে সর্বকালে। যদিও এঁরা সকলেই বৃদ্ধ হয়েছিলেন ও পরিণত বয়সেই লীলা সংবরণ করেন।" আমাদের ঠাকুরও তাই এ-কথা শুধু বলেই গেলে যান নি—তিনি জগজ্জননীর এক অতুলনীয় ভাবময় মূর্তি গড়ে ও মণিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণ করে দিলেন। আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন—মণিমন্দিরের সারদা মার বিগ্রহের রূপের তুলনা নেই—দর্শন মাত্রেই তা মনে গেঁথে যায়—স্মরণ-মনন-ধ্যান-ধারণার এক সহজ সুন্দর অবলম্বন হয়ে মনকে দিব্যমুখী করে তোলে। মণি-মন্দিরের সারদামণি যা যেন তুষার আলোকরা রূপে নয়নে ঝলকায় অমিয় ধারা ঢেলে অন্তরে প্রাণকাড়া স্মিত হাসি হেসে ডাকছেন তাঁর সব-হারান সন্তানকে—ওরে তোরা আয়, আমি তো রয়েছি!

ডঃ অমলেন্দু মিত্রের রাঢ়ের সংস্কৃতি'র উপর

ডঃ অমলেন্দু মিত্রের "রাঢ়ের সংস্কৃতি" পুস্তকখানি নিঃসন্দেহে রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে 'ধর্ম'-পূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রভাবের এক অতি মূল্যবান দলিল। ডঃ মিত্রের নিষ্ঠ পরিশ্রমলব্ধ তথ্য-পঞ্জীর ধারাবাহিকতা, উপস্থাপনা-বিন্যাস, বিশ্লেষণভঙ্গী ও ভাষার প্রাঞ্জলতা সবই প্রশংসনীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁহারা যথেষ্ট মৌলিকতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই এই তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকখানির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও আলোচিত বিষয়ে ডঃ মিত্রের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ডি. ফিল্ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

রাঢ়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় ধর্মপূজার প্রচলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনুন্নত গ্রামবহুল এই দেশের উপত্যকা অঞ্চলটি বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের এক বিরাট অংশ অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত। ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং বঙ্গ-সংস্কৃতির এক সুমহান ঐতিহ্য স্থাপিত হইয়াছে যাহার কল্পধারা আজিও তথাকথিত সভ্য সমাজজীবনে নিঃসঙ্গে প্রবাহমানা। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এবং পথশ্রমের নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া ডঃ মিত্র ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন পীঠ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের নিকট হইতে ঐস্থানে ধর্মপূজার উৎপত্তির ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকের চাক্ষুষ ধারণা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে সুন্দর আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুস্তকাকারে তাহা প্রকাশিত করিয়া এক অবহেলিত ও অজ্ঞাত বিষয়-বস্তুর প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

সিউড়ীর সুপরিচিত মিত্র বংশ 'বীরভূমের ইতিহাস' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং বিবিধ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ মিত্রের পিতা ৺গৌরীহর মিত্র ও পিতামহ ৺শিবরতন মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রাঢ়ের সংস্কৃতি' গ্রন্থখানির মাধ্যমে ডঃ মিত্র নিজেকে ঐ বংশের একজন অতি সুযোগ্য উত্তরপুরুষ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি এই বিষয়ে আরও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট। আশাকরি—অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার নিরলস অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রসূত আরও-মূল্যবান তথ্য বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারাকে পুষ্ট করিবে।

ডঃ মিত্রের কর্মবহুল দীর্ঘজীবন ও তাঁহার পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সত্যানন্দ - বাণী

বাসনার সংসর্গক্ষমতা

বাসনার ছোঁয়াচে স্বভাব ····
একটা বাসনা আর একটা বাসনার উদ্রেক করে।
উদ্রিক্ত বাসনা সমধর্মী বা পরধর্মী হয়।

·····যেমন একটী রসগোল্লা খেতে খেতে আর একটী সন্দেশের ক্ষুধা জাগে। আবার একটী সন্দেশের স্পর্শে মন চঞ্চল হ'য়ে অন্য বাসনার ক্ষুধা জাগায়

—বেদমন্ত্র (৫ম পর্ব্ব)

আলোচনা : স্বামী নির্ব্বেদানন্দজী

রোগের ছোঁয়াচে ভাব আছে। Infectious disease অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধি একের থেকে অপরে সংক্রামিত হয়। তেমনি বাসনাও সংক্রামক রোগের মতই মানুষকে এক বাসনা থেকে আর এক বাসনায় নিয়ে যায়। বসন্ত রোগের একটী বিষ শরীরে প্রবেশ করলে সেটাই যখন সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ফোটকের আকারে manifest হয়—প্রকাশ পায় তখন রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। তেমনি একটী বাসনা যদি মনকে স্পর্শ করে তো তার থেকেই জাগে অসংখ্য বাসনা আর তখনই মানুষ শত বাসনার দহন জ্বালায় জ্বলে হয়ে পড়ে দিশেহারা। অনেকে বলেন, বাসনা বা কামনা ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হয়, ভোগ করতে করতে বাসনা কমে যাবে, তখন ভোগে আর তৃপ্তি হবে না, সুতরাং অকারণ ভোগ ছাড়ব কেন? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলছে "ন কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি"—কামনার দ্বারা উপভোগ শান্ত হয় না।

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভি বর্দ্ধতে"—

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন যেমন আরো জ্বলে ওঠে তেমনি কোন কামনাকে প্রশমিত করার জন্য যদি ভোগের আশ্রয় নেওয়া হয় তো কামনাটী দূরীভূত হওয়া তো দূরের কথা বরং তা শতগুণ তীব্রভাবে জ্বলে উঠে আমাদের মনকে করবে অশান্ত চঞ্চল। কাজেই উপভোগে তৃপ্তি আসে না বরং লালসাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তাই ভগবান রামকৃষ্ণ সমাধান দিলেন—ওগো, খুব ছোট ছোট বাসনা ভোগ করে নিতে হয়। কিন্তু বড় বড় বাসনাকে জোর করে ত্যাগ করতে হয়।

শ্রীঠাকুর বলছেন—মনে বাসনা জাগল, জরির শাল গায়ে দেব। মথুর শাল এনে দিলো। সেই শাল গায়ে দিয়ে বললাম, মন, এরি নাম জরির শাল—বলেই গা থেকে খুলে থু থু করে ফেলে দিলাম। আবার একবার সাধ হ'ল গুড়গুড়িতে তামাক খাব। মথুর আনিয়ে দিল। দুবার টান দিলাম। মনকে বললাম, মন, এরি নাম গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। তারপর ফেলে দিলাম।

ছোট ছোট বাসনাগুলি কিভাবে ত্যাগ করতে হয় শ্রীঠাকুর সেই এইভাবে তার practical demonstration দিলেন। অবশ্য ঠাকুরের পক্ষে যা সম্ভব সাধারণের পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা হবে ভোগের দিকে না যাওয়া, কারণ সংক্রামক ব্যাধির মতই তা মনকে রুগ্ন করে ফেলে। সাধারণ দুর্বল-চিত্ত মানুষের ক্ষেত্রে তাই ভোগ-বাসনা চেপে দেওয়াই ভাল। বাসনাকে কি করে জয় করতে হবে সে প্রসঙ্গে আমাদের ঠাকুর বলেছেন—"মৃত্যুকে সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে আর বিচার ক'রবে যদি এই মুহূর্তেই মরে যাও তাহ'লে কি বাসনা-কামনা নিয়ে যাওয়া ক'রবে? কিসের প্রতি এখনও আসক্তি আছে? যদি ভাখো যে কোন বাসনা আছে তো সেটাকে দূর ক'রবার চেষ্টা করবে। ছোট-খাট বাসনা মিটিয়ে নেবার মত হ'লে মিটিয়ে নেবে। কিন্তু বড় বড় বাসনা সব ঠাকুরের নাম ক'রে তাড়াবার চেষ্টা করবে।" সুতরাং বড় ভোগ থেকে সর্ব্বদাই আমাদের দূরে থাকতে হবে। বৃহৎ বা ক্ষতিকর বাসনার ধার দিয়ে যাওয়া চলবে না, সেটা ভোগ করতে যাওয়াই মানে বিপদ ডেকে আনা—তাকে চেপে দিতে হবে।

ছোঁয়াচে রোগ যেমন একজন থেকে আর একজনে বিস্তৃতি লাভ করে বাসনাও তেমনি। এক বিষয়ের বাসনা থেকে আর এক বিষয়-বাসনা জাগে—একটী বিষয়ের বাসনা শুধু সেই বিষয়ে পরিতৃপ্ত হয় না, তা আবার অন্য বাসনাকে টেনে আনে—যেমন, রসগোল্লা খেতে খেতে বাসনা জাগল সন্দেশ বা অন্য কিছু খাবার আবার তার থেকে হয়ত এসে পড়ল অন্য বিষয়-বাসনা। কাজেই দেখা যাচ্ছে মানুষের বাসনাগুলি দু'রকমের—সমধর্মী অথবা পরধর্মী। রসগোল্লা খেতে খেতে যখন রসগোল্লা বা সন্দেশ খাবারই বাসনা জাগছে তখন সেটী সমধর্মী বাসনা অর্থাৎ একই বিষয়ের বাসনা সেই বিষয়েই বাসনা জাগাচ্ছে বা বাড়াচ্ছে। আবার যখন মন এক বিষয়ে চঞ্চল থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে যেমন মনে অর্থ কামনা চলতে চলতে সেই কামনাই মনকে কামের দিকে নিয়ে গেল তখন সেটী হবে পরধর্মী বাসনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ত্যাগ সম্বন্ধে বলেছেন—যদি তামাক ত্যাগ কি ত্যাগ? কামিনী-কাঞ্চন তাদেই ত্যাগ। কাঞ্চন ও কামিনী—এ দুটো এত নিবিড়ভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত যে, এদের যে কোন একটা বাসনা মনে উঠলে তার থেকে অপরটার উদ্রেক হবে। কারণ বাসনার ছোঁয়াচে স্বভাব। বাসনা আমাদের মনকে বিষাক্ত করে তোলে। এক বাসনা থেকে মন যাতে অন্য বাসনায় যেতে না পারে সেজন্য কোন বাসনা মনে ওঠা মাত্র তাকে দমন করবার চেষ্টা করতে হবে। বাসনাকে তাড়াতে না পারলে তার পরিণাম হবে বিনাশ।

গীতায় বাসনা সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে—অর্থাৎ আসক্তি থেকে কামনার উৎপত্তি। তার ছোঁয়াচ লেগে ক্রোধের উদ্রেক। ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ—ক্রোধ থেকে মোহ—সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ—মোহ থেকে স্মৃতি-লোপ—স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশঃ—স্মৃতিলোপ থেকে বুদ্ধিনাশ—বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ।

বাসনা ধাপে ধাপে মানুষকে কিভাবে বিনাশের পথে নিয়ে যায় সেই steps-গুলি গীতায় দেখানো হয়েছে। তবে সকল সময়, সকল ক্ষেত্রেই যে বাসনা এই ধাপগুলি অনুসরণ করেই মানুষকে বিনাশের পথে নিয়ে যাবে তা নাও হতে পারে। এই steps-এর ক্রমগুলি না থাকতেও পারে—এর যে কোন একটা step থেকেও মানুষের চরম পরিণতি ঘটতে পারে।

কোথাও সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটলে তার ছোঁয়াচ বা আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে যেমন

আসে থাকতে টিকে নিতে হয় প্রতিষেধক হিসেবে অথবা সে-স্থান ত্যাগ করতে হয়, তেমনি বাসনার স্পর্শক্রামতা থেকে বাঁচতে হলে ভোগ বাসনাকে কৃমি-কীটের বস্তু, হেয় বস্তু জ্ঞানে ত্যাগ করতে হবে। অন্তরে সত্য শিব সুন্দরের টান সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন গুরু ইষ্ট মূর্তি রেখে, মহাপুরুষদের ছবি টাঙিয়ে, গীতা - চণ্ডী - ভাগবৎ - কথামৃতাদি সদ্‌গ্রন্থ কাছে রেখে, দিবা ও ভক্তিমূলক গান গেয়ে, ধূপ জেলে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিজের চারিপাশে একটা দিব্য পরিবেশ গড়ে তোলা। বাসনার উন্মেষ মাত্র সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসা, তাঁর উপদেশ শ্রবণ ও স্মরণ, মহাপুরুষদের উপদেশাবলী স্মরণ, তাঁদের পূত সংসর্গলাভের চেষ্টা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করে বাসনাকে দমন করার প্রয়াস পেতে হবে।

বাসনা সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন, "বাসনা যেন অষ্টপাশ ভোগের বস্তু দেখলেই শত বাহু মেলে জড়িয়ে ধরবে। তীক্ষ্ণ ছুরী দিয়ে ডুবুরীরা তার বাঁধন কাটে। তেমনি আমাদের বাসনার অষ্টপাশও কেটে ফেলতে হবে—তাঁর 'নামে', তাঁর চরণে 'প্রার্থনা' ক'রে।"

বাসনাকে জয় করার সব চেয়ে সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় বলে দিলেন ঠাকুর—নাম ও প্রার্থনা। ঠাকুরের চরণে তাই প্রার্থনা তাঁর নামে আমরা যেন বাসনামুক্ত হয়ে 'মাটির উর্দ্ধে উঠতে' পারি, আনন্দলোকের সন্ধান পাই।

※

আশ্রম-সংবাদ

দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সারদা-কাত্যায়নী-পূজা ও অভেদানন্দ মেলা

আমাদের শাখা আশ্রম দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এবছর সপ্তাহব্যাপী অভেদানন্দ মেলা ও সারদা-কাত্যায়নী পূজা সুরু হয় গত ১২ই ডিসেম্বর '৭২ থেকে। ঐদিন সন্ধ্যায় বিশ্বকল্যাণ হোম ও সর্বধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য গত দুবছর মেলা বন্ধ থাকার পর এবছর আবার মেলা সুরু হওয়ায় এ অঞ্চল আবার যে আগের মতই প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে, আশ্রম-প্রাঙ্গণে মেলা-উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের প্রাক্‌মুহূর্তে বিপুল জনসমাবেশই তার প্রমাণ।

উদ্বোধন-মণ্ডপে পরমগুরু স্বামী অভেদানন্দের ফুলমালো সুশোভিত মূর্তির সামনে সাধুবৃন্দ পরিবৃত হয়ে সঙ্ঘপতি স্বামীজী মহারাজ আপন আসনে উপবিষ্ট। সামনে বিশ্বকল্যাণ হোমের আয়োজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পরম পূজনীয়া মা আশ্রম মাতৃবৃন্দের সঙ্গে মণ্ডপে শুভাগমন করলেন। স্বামী অরূপানন্দ কর্তৃক

অনুরুদ্ধ হয়ে স্বামীজী তাঁর উদ্বোধন ভাষণে বলেন—"গত দু'বছর গোলমালের জন্য মেলা বন্ধ ছিল। বড় আনন্দের কথা যে ঠাকুরের কৃপায় আজ আবার মেলা সুরু হল। আজ স্থূলভাবে ঠাকুরের অন্তর্ধান হলেও সূক্ষ্মভাবে তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ঠাকুরের কৃপা আমরা আজও বহুভাবে পাচ্ছি। তিনি এই মেলার প্রবর্তন করেন সর্ব্বধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে এই মেলায় মিলিত হয়ে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের যে সুবর্ণ সুযোগটুকু পান শ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনা সেই সুযোগটুকু যেন চিরকাল বজায় থাকে।" স্বামীজীর ভাষণের পর আশ্রমের মায়েরা সমবেত কণ্ঠে গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ থেকে সুর সহযোগে স্তোত্র পাঠ করেন। ওদিকে বিশ্বযজ্ঞের কল্যাণ-হোমশিখাও প্রজ্বলিত হয়েছে। স্তোত্রাদৃত পাঠের পর গিরিবালী নারী মহাশয় সংস্কৃতে ভাষণ দেন। তারপর স্বামীজী বেদমন্ত্রপাঠ করেন। জনাব মৌলবি খলিলুর রহমান সাহেবও পবিত্র কোরাণের বাণী পাঠ করে এক আবেগময় ভাষণ দেন। স্বামীজী পবিত্র বাইবেল থেকেও কিছু অংশ পাঠ করলেন। শ্রীঠাকুর রচিত "যুগে যুগে যার আসা", "যুগাচার্য্য", সত্যানন্দ-বাণী, শ্রীঅর্চ্চনাপুরী রচিত "জননী সারদেশ্বরী", "শ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও কাহিনী" এবং সাধনাপুরী রচিত "শ্রবণ মঙ্গলম্" প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও অংশবিশেষ পাঠ হয়। অবশেষে সমবেত কণ্ঠে অভেদবন্দনার মধ্য দিয়ে মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান দিব্য পরিবেশে সমাপ্ত হয়। সপ্তাহব্যাপী উৎসবে অভিনয়, বাউল, যাত্রা, কীর্ত্তন, খেলাধূলা, শিশু সম্মেলন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রায় প্রতিদিনই নানা শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রও দেখানো হয়। দৈনিক প্রায় এক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আশ্রম-মন্দিরে সারদা-কাত্যায়নী দেবীর সপ্তমী, অষ্টমী, নবম্যাদি বিহিত পূজা মেলার আনন্দমুখর পরিবেশে সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয়। প্রতিদিন পূজার সময় চণ্ডী, গীতাদি পাঠ, আরত্রিকাদি, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ হয়।

×

শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতী সংবাদ :

আমাদের সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতীর নৃত্য বিভাগের ছাত্রী শ্রীঅপর্ণা মুখোপাধ্যায় এই বৎসর All Bengal College Drama *Dance* Competition-এ বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আমরা তাঁহার আরও কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

WORLD PSYCHOLOGY

SREEMAT SWAMI SATYANANDA DEVA

[*Contd. from "The Western Psychology*]

DESCARTES (1596)

Descartes may be called the father of modern psychology and he was mainly interested in intellectualism in psychology.

His epistemological dual theory of mind and body is also accepted in his psychological dealings.

The body is matter and is a part of world of matters. Soul is different from it and does not move the body. There are subtle airs called animal spirits. They consist of finest particles in the blood. These by their motion in the nerve substance cause the body to move. The cause, why same cause may excite different passions in different men, is given by Descartes. He opines, all brains are not constituted in the same way.

Now, the heat and movement of the limbs is caused by the body itself and not by the soul.

The soul has thoughts which are of two kinds –the actions and the passions. The actions or volitions have two forms. Some actions of the soul, like the will to love God, terminate in some non-material objects.

There are other willings that terminate in our body.

Again, soul has the power of cognising or awareness. The cognising of our volitions is caused by the soul. But some cognising have their origin in the body. The soul can imagine something that has no existence, like a chimera. But there are imaginings which are caused by the body depending on the nerves, the spirits and traces of part impressions, as in day-dreams

In cognising external objects, the external objects at first stimulate the external senses. They are also excited by the nerves and the brain which then cause the soul to sense them.

Though the soul is united in all parts of the body conjointly and not in any one part or parts, it exercises its function more specifically through a small gland in the brain. This gland is the only place, according to him, that can unite the double images from the double external sense-organs like the eyes, the hands, and lead to a single thought.

He says that the light reflected from a body forms two images one on

each side of our eyes. The two images through the optic nerves form two others in the brain which takes them in its cavities. From these by way of the spirits that are in the cavities, the images are cast on the small gland. The spirits encircle the gland with both the images corresponding in a similar way forming one image on the gland. This is an example of the images uniting in the gland in the mid-brain. Again, when a terrifying object is seen, the image makes a reflection on the spirit. The spirits have a predisposition from the past impression of fear or courage. These spirits then proceed partly in the nerves which serve in turning the back and moving the legs, partly in those which enlarge or contract the heart, partly in those which enlarge or contract the orifices of the heart or which agitate the other parts when the blood is sent to the heart so that this blood being rarified comes to the brain cavity that is suited to maintain and fortify the passions of fear, that is to say, suited to hold open or reopen those pores of the brain which conduct them to those same nerves. The pores by which they pass chiefly operate through the small nerves that make the orifices of the heart contract or enlarge causing the soul to feel the pain mainly in the heart.

He defines the passions of our soul as cognisings or feelings of emotions of the soul.

Cognisings are all thoughts which are not actions. These are perceptions, feelings, emotions and the processes of induction and reasoning.

The active soul has volitions including attention, recollection and phantasia. Passions are generated in the sensations. Sensations are passions referring to external objects of smell, sound etc. Volitions are emotions that arise from the soul. In his consideration of passion we find two things. Firstly, the ideas and feelings have to be associated. Secondly, he gives the purely physical aspect of emotions that are intended to give suitable response to given circumstances. It suggests the James Lange Theory.

A PEEP INTO A PRIVATE LIFE

SWAMI BIMALANANDA

The man lost his father, an honoured Brahmin of the village, in his boyhood and in his later days he lived with his mother and his wife. Though a renunciate both formally and materially, his life-long contact with these two nearest relatives—his mother and the wife—is worth-remembering and inspiring too in regard to the ideals of wordly life in a family. It is strange that this man, in spite of his long-standing zest for God-realisation, did not forget to attend to his mother and wife. He said, "Till you have to attend to your own person, you should attend to your mother too."

Once it was almost settled that he would stay with a great devotee of Brindaban, when she had requested him so. But as soon as he remembered his mother and her old age, he came back to her place. Even after his formal initiation in Sanyas, he did not like to take 'Ochre' garbs only because his mother might be pained. Yes, the trio are Godman Sri Ramkrishna Deva, his mother Sri Chandramani and his wife Sri Sri Ma Saradamoni. The life of this son and his mother reminds us of another mother and her son—Sachimata and Nimai of holy Navadwip.

But more charming are the episodes of how Sri Ramkrishna Deva behaved as the renunciate Sanyasin, with his married wife, Sri Saradamani Devi. History records that Chandramani was in search of a bride and was to arrange for his marriage in order to cure him of his madness (as the villagers called his spiritual frenzy). But when proposals were not maturing readily, her son himself, to her surprise, settled the bride and behaved himself as the most enthusiastic hero of the occasion. After the marriage he returned to Dakshineswar Kali temple, only to get himself absorbed in his own spiritual Sadhana.

In the meantime, Sri Sarada came to Dakshineswar for the first time. Seeing his wife diseased and tired of a long journey on foot from Kamarpukur to Dakshineswar, affectionate Sri Ramkrishna told her softly, "And you have come after so long a time. Do I have my 'Seja babu' (Mathuramohan) that he will take proper care of you?" However, he took all care about

her and started himself training her as to how she could be an ideal wife, an ideal mother.

Peeping into the private life of a couple is not always socially acceptable. Yet the novelist does it time and again by his imagination, and their novels sell like hot cakes. These are sometimes fictions, but here you will listen to some such facts of the divine couple only to see that truths are stranger than fiction. Sure, you will feel in it a sweetness, beauty and grace of a divine relation.

Sri Ramkrishna lived in his room in Dakshineswar, a few yards away from 'Nahabat' where Sri Sarada lived in a dark room in the ground floor. The room had a size of utmost 6 ft in length and so in width.

Now, one evening, Sri Sarada came to Sri Ramkrishna's room to serve his meals. It was getting dark and Sri Sri Thakur was in an ecstatic mood. A little after, Srl Sri Ma Sarada was going out and there was a click at the door and Sri Ramkrishna thought her to be Lakshmi his neice, going away. Addressing her as 'Tul' (You) instead of 'Tumi', he told her 'Do shut the door when 'Tui' (you) go out'. 'Oh yes, I am just closing it', came the soft response. But, as soon as he could follow the voice to be of Sri Sarada and not of Lakshmi, Sri Ramkrishna said at once, 'Oh ! it is 'Tumi' (you), I am sorry, I thought it was Lakshmi, please don't mind." And at dawn again, he went to 'Nahabat' and rather apologised, "Please mark, the whole night I spent sleepless, all the time I thought why I had used such harsh words."

One day again, when Lakshminarayan, a Marwari devotee wanted to make a gift of ten thousand rupees in the name of Sri Sri Thakur Ramakrishna, he felt helpless. He himself describes that he told the Mother (Kali) "Oh Mother, would you please like to drag me to temptation after so many days ?" At that time he called Sri Sarada and with a view to judging her attitude just playfully, he told her, "Look here please, he wants to give me this amount of money, but I have told him that I can't take it. And now he wants to give it in your name. Would you please receive it ?" On hearing this atonce she said, 'How should it be so ? That money cannot be taken. If I take it, it will be actually taken by you. People do respect you for your renunciation and money cannot be taken." Srl Ramkrishna describes his feelings at this reply, "I breathed a relief when she told like this." What a wonderful synthesis of a household loving relation and a renunciate life !

We know that Sri Ramkrishna Deva practised renunciation of wealth and passion. But how could he do so? Worth-remembering in this context is a conversation between them. When Sri Sarada came for the first time to Dakshineswar to live with his divine consort, Sri Ramkrishna told her, "Well, dear! Have you come here to pull me to the ordinary life?" At once came the historic reply, "No my dear, why should I drag you to the life of passions? I have come here to help you in your path to God." And Sri Ramkrishna became ever grateful to this most honourable and soulful lady. He said, "Unless she would be so good, and if she pulled me to call of passions, who can guarantee whether my barrier against passions would not give in?"

Everybody knows about that historic occasion when Sri Ramkrishna Deva surrendered all the fruits of his spiritual struggles at the feet of Sri Sarada Devi about whom he thought, "The Mother who lives at 'Nahabat', the Mother who gave birth to Sri Ramakrishna and the Mother who is there as 'Bhabatarini' in the temple—are one and the same."

Let us be blest with a bath in the purity of love the episodes bring to They need no interpretation.

Francis Thompson—The poet of the Return to God

Shailendra Nath Chakraverty

In Thompson's view the best way to know the joy of life is to embrace suffering in the spirit of Christ. On Calvary there was a spear that pierced the heart of Christ. Let it pierce our heart, and the joy and fear take possession of the soul :

"On Calvary was shook a spear ;
Press the point into thy heart—
Joy and fear :
All the spines upon the thorn into curling tendrils start."

(*The Mistress of Vision*)

Thus, by following Christ, the spirit of Love, all the thorns of life's suffering would turned into joy. *

To a Catholic, without Virgin Mary, Christ is inconceivable and without both, God. Thompson's view of God is unmistakably bound up with his faith in Jesus Christ, Virgin Mary and the Church. Thompson's first published poem *The Passion of Mary* was inspired by Our Lady. Mother of Jesus Christ, Mary is the perfection of sensible nature and as such the reflection of the divine. Thompson always turned to Mary in his agony for hope and solace :

"O thou who dwellest in the day !
Behold, I pace amidst the gloom ;
Darkness is ever round my way
With little space for sunbeam-room.

O light in Light, shine down from Heaven !"

(*The Passion of Mary*)

Thompson preserved his love for Virgin Mary until his death. His faith in Mary and religion had saved Thompson from utter destruction during his outcast days in the streets of London. In later days, when he had written a song in her praise, *Assumpta Maria*, most humbly he appealed to her :

"Remember me, poor Thief of Song." †

---

* cf. " and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy." —St. John. XXI, 20.

† cf. "How completely that petition was granted, fifteen years later when the poet lay dying, a nurse attempted to remove the medal of Our Lady which he had always worn about his neck. He could no longer speak. But his skinny hand was raised in protest. So the medal remained with him to the end."

—Rev. T. L. Connolly, S. J : *Francis Thompson : In His Paths* (1944)

The consideration of Thompson's view of God through Christ and Mary, has inevitably led us to the Church within which he was himself an artist adding to its beauty. Though in his life time Thompson would scarcely have been considered an orthodox churchman, he was, nevertheless, as a writer, a follower of the Church. The nearer Thompson drew to his Father, God, the more he reflects the grandeur of his Mother, the Church, Christ, as the Head of the Church, Thompson belived, presented before the christians an example of supreme order and law. The Church, therefore, condemns lawlessness in man's life because it is opposed to God's rule.

But above all, there is God, Who is the Fountainhead of all wisdom. Wisdom comes from God through prayer and leads to God through the hard struggle of conforming our lives to His law which She (Wisdom) lays bare to us as it was exemplified in the life of Christ. Wisdom accomplishes all this primarily through the grace of God, for, as Thompson says :

"Wisdom's gifts are buried deeper
Than the arm of man can go."

(*Laus Amara Doloris*)

Thompson's view of God is that of a simple and utterly unique perfection. All the perfections that we say God has in such amazing variety—they are all one, a unity that is simple, indivisible. "God's supreme unity," says St. Francis de Sales, "gives everything its distinction ... The perfection of his unity is above all distinction, all variety ; it knows how to call into being all manner of created perfections, and is capable of doing so. "It is Thompson's firm conviction that anything at all, whatever it is, exists only as a result of this single, unique, utterly simple, eternal actuality—God. God is creator and all things in nature are His creature. In the hierarchy of creation God rules over all :

"..... the hierarchical
Vision lies unoccult, rank under rank
Through all create down—wheeling, from the Throne
Even to the bases of the pregnant coze."

(*An Anthem of Earth*)

In the light of the above study, we can sum up Thompson's view of God thus : Thompson holds that man in his ignorance and confusion thinks God as unkind and wrathful, but he understands God's love and greatness when he shakes off his foolish doubts and fear and his petulant nature. Mixed with man's lack of trust in God, there is also a longing for Him. The flight from God causes fear in man, but there is also a longing to be captured by Him. Inspired by the fact that there would never be a shadow if there were no light, and hence never a sorrow were there not a Hand to wipe away the tears, Thompson asks :

"Is my gloom, after all,
Shade of His hand, out-streched caressingly ?"

(The Hound of Heaven)

Further, Thompson's idea of God is unmistakably bound up with his idea of Jesus Christ—the Second Person of the Blessed Trinity, the Word Who embraces the beginning and the end of all things. In Christ, the Word, the Image and Splendour of the Father, became flesh. The love of God for man shines out more clearly in the mystery of the Incarnation. God stoops to man, through the Incarnation, to raise him to Himself. Thompson also draws inspiration from both Virgin Mary and the Church, for the regeneration of his spiritual life and for his poetic achievement. He finds unity in the diversity of God's creation, and this is one of the cardinal points on which Thompson's view of God rests. Rejoicing in an omnipresent consciousness of the Divine Immanence in all things, Thompson cloaks them vividly and completely with the Divine Presence. Thompson, endowed with an intuitive vision sees great harmony in God's creation and so he declares boldly : "To be the poet of the return to Nature is somewhat, but I would be the poet of the return to God."

REFERENCES

1. Bible, The Holy.
2. Connolly, Rev. T. L., S. J. (ed) : *Poems of Francis Thompson* (1941)
3. do : *Francis Thompson : In His Paths* (1944)
4. de Sales, St. Francis : *The Love of God.* Tr. by Vincent Kerus (1962)
5. Le Buffe, Francis P., S. J. : *The Hound of Heaven : An Interpretation* (1958)
6. Meynell, Everard : *The Life of Francis Thompson* (1913)
7. Wright, Rev. T. H. ; *Francis Thompson and His Poetry* (1927)

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by —

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE 45-3987

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবাশ্রম হইতে প্রকাশক স্বামী দেব কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও অভেদানন্দ মুদ্রণালয়
২৩৩৩, শোভাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যা ৩০ পয়সা।

Regd. No. C-1659 • BHARMUKHI • Phone : 56-2770

In the Service of the Nation

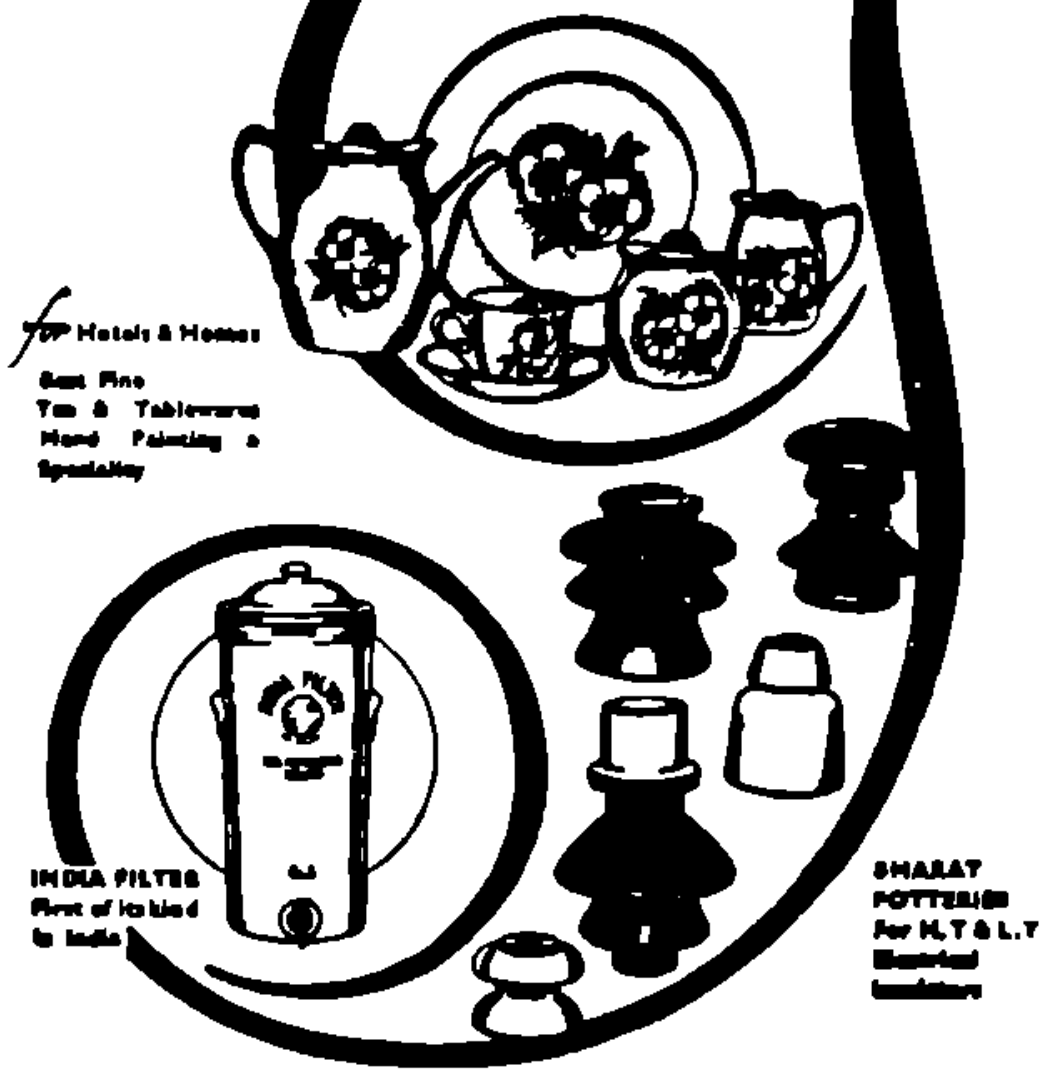

Manufacturers & Exporters

INDIA POTTERIES LIMITED

91, DHARAMTALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

পত্রিকাপরিচিতি :— বারাণসীস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে "শ্রীমন্দির" (শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তানন্দ দেবের ব্যবহৃত্ত বস্ত্রাদিসহ মন্দির) ও শ্রীমৎ স্বামী সন্তানন্দ দেব প্রতিষ্ঠিত—"মণিমন্দির" (সন্তান ৪৭৫ সিদ্ধিত এই মন্দিরে শ্রীশ্রীবিন্দুবাসিনী, শ্রীশ্রীমাতৃকা, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী সন্তানন্দের বস্ত্রাদিসহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত)।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদক—স্বামী ঈশানন্দ। যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও তাঁর সহীর ভট্টাচার্য। সহ-সম্পাদক—স্বামী হীরানন্দ ও বুদ্ধেন্দ্র গুপ্ত। শিল্পী :—শিবরাম দত্ত ও ডঃ সত্যব্রত। এজার সদস্য—স্বামী সদানন্দ, স্বামী তত্ত্বেশ্বরানন্দ, স্বামী অমলানন্দ ও ডঃ তারক চৈতন্য। বার্ষিক মূল্য টাঃ ৬'০০